অগ্নিবাণের পঞ্চবাণ

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক

নীহাররঞ্জন রায়
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৭১

মুদ্রাকর

নিত্যানন্দ চৌধুরী
নিউ অ্যাসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স
৩ মসজিদ্ বাড়ী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

এই লেখকের :

বাঘের ভয়ে
এক কুমীর এক চোর
পিরামিডের মাথার মানুষ

নিঃশঙ্ক ভবিষ্যতের ভরসায়
বুবুলের শৈশবকে

এক

কিছু টাকা, কত টাকা কী তার পরিমাণ কেমন ওজনের এসব কেউ বলতে পারে না, তবে বেশ কিছু টাকা যে পেয়েছেন অগ্নিবাণ ব্রহ্ম, এ বিষয়ে পাড়ার লোকের সন্দেহ মাত্র রইল না একদিন। এবং লোকমুখে শোনাও গেল লাখটাকার কম নয়।

পাড়ার বুড়ো মাঝবয়সী লোকের দল একদিকে, আর ছেলেছোকরার দল আরেক দিকে এই নিয়ে তুমুল জল্পনা কল্পনা শুরু করে দিলে, গোপন সভা বৈঠক বসিয়ে দিলে। কেউ কারও কথা আড়ালে কান পেতে শুনছে কিনা এ জন্যেও ছেলে আর বুড়োদের দলের ছদ্মবেশী গুপ্তচর আনাচে কানাচে ঘাপটি মেরে রইল। বুড়ো দেখলেই ছেলে ছোকরার দল কেমন সন্দেহর চোখে চায়, আবার বুড়োরা কোন ছেলে বা ছোকরা দেখলে এমন চোখ পাকিয়ে বা নাক সিঁটকে তাকায় যেন পারলে পুলিশে দেয়, কি ঘা কতক বসিয়ে দেয়!

অগ্নিবাণ ব্রহ্ম কিন্তু যেমনটি ছিলেন তেমনই থাকেন। ঠোঁটে তাঁর না বেশি হাসি, মুখ তাঁর না একেবারে বোবা। বুড়ো দেখলে যেমন হাত তুলে কপালে ঠেকান, ছেলে দেখলেও তেমন মুচ্‌কি হেসে পিঠে হাত রাখেন। অথচ ছেলে বুড়োর কেউই আসল কথাটা সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারছে না তাঁকে!

বুড়োরা ভোর বেলা স্নানের ঘাটে অগ্নিবাণ ব্রহ্মের সঙ্গে স্নান করতে করতে ভেবেছে, কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবে না কি।

সাহস করে কেউ হয়ত কাছে সরে এসেছে অগ্নিবাণের, ভেবেছে গলা বাদে দেহের সবটুকুই তো জলের ভেতর, সুতরাং লজ্জা করবে না খুব বেশি। মাথাটুকু উঁচু করে গলা দিয়ে স্বরটুকু শুধু বার করে দেওয়া।

বলব বলব করে কিছুতেই বলা হয় না কিংবা বলার সুযোগ ফস্‌কে যায়। যেমন জলের মধ্যে স্রোতের টানে কেউ হয় তো অগ্নিবাণের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার ঠিক আগের মুহূর্তে মনের কথা বুঝতে পেরেই বুঝি ডুব মারেন অগ্নিবাণ ব্রহ্ম জলের তলায় !

আর যে জিজ্ঞাসা করতে যায় তার মনে হতে পারে সত্যি বুঝি জলে আগুন গেল নিভে।

বুড়োরা যেমন স্নানের ঘাটে ভোরবেলায়, ছেলেরা তেমনি খেলার মাঠে বিকেলে অগ্নিবাণ ব্রহ্মকে দেখতে পেলেই কথাটা একবার মনে মনে চিন্তা করে দেখে। সাহসী ছোকরাদের কেউ হয়তো এদিক ওদিক চাইতে চাইতে এক-পা এক-পা করে সরে এসে ভিড়ের মধ্যে ঠিক দাঁড়াল অগ্নিবাণ ব্রহ্মের পাশটিতে।

খেলার মাঠে অগ্নিবাণ ব্রহ্মকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না বয়স তাঁর ষাট ছাড়িয়েছে।

আর খেলা একবার জমে গেলে দেখে কে অগ্নিবাণকে ! হাত পা ছোঁড়েন, হাতের ছাতা পড়ে যায়, পায়ের জুতো ছিটকে পড়ে ; ভুলে যান বয়স তাঁর ষাটের বেশি, আর নাম অগ্নিবাণ ব্রহ্ম !

ছোট ছেলেদের মত মুখে মুখরোচক কিছু একটা পুরে চিবতে থাকেন অগ্নিবাণ ! সাহসী ছোকরা মনে মনে ভাবে ঠোঙা শেষ হলেই কথাটা পাড়বে।

কিন্তু অবাক হয়ে যায়। ঠোঙা শেষ করে মুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তারপর আর কালবিলম্ব না করে মুখের ভেতর থেকে ঝক্‌ঝকে নকল দাঁতের পাটি খুলে নিয়ে যত্ন করে দামি সিগারেট কেসের মতো পকেটে পুরে রাখেন।

অগ্নিবাণের ফোগ্‌লা গালের দিকে তাকিয়ে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারে, একটি কথাও বলতে পারেন তিনি, কিংবা বললেও বোঝা যাবে না কি তাঁর মুখের একটি কথাও ! খুব হতাশ হয় সাহসী ছোকরা। মনে সাহস নয়, উৎসাহই থাকে না ! হঠাৎ বুঝি দমে যায়।

অগ্নিবাণ ব্রহ্মকে দেখে বোঝার উপায়ও নেই তিনি বুড়ো কি ছেলে ছোকরার মনের ভাবটা আন্দাজ করতে পেরেছেন কি না। ছেলে বুড়ো সবাই তাঁর সম্পর্কে দিন রাতই কতো কী ভাবছে। কিন্তু তিনি নিজে ভেবে দেখেছেন কী তাদের চিন্তাটা একটিবার! তাঁর বাবা সর্বনাম ব্রহ্মকে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের মতোই জ্ঞান করতেন। তাঁর বাবা কুকুর বেড়াল, হাতি ঘোড়া সকল কিছুকে একই চোখে দেখতেন, সেই রকম অগ্নিবাণও মাস্‌টার ছাত্র কিংবা ছেলে বুড়োর মধ্যে কোন ভেদ জ্ঞান করেন না।

ছেলেপুলে নেই, মনের মতো চাকর পেয়েছিলেন অনেকদিন আগে দেশভ্রমণের পথে রেলগাড়ির এক কামরায়। প্রায় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের মতো।

ছোকরা টিকিট কেটেই গাড়িতে উঠেছিল। যাবার বিশেষ একটা জায়গাও ছিল, তবে দেখা করার চেনা জানা লোক ছিল না কেউ, কাউকে খুঁজে পেতে বার করে নেবে, এই রকমই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এমন জোর ঘুমিয়ে পড়েছিল যে ঠিক ‘স্টেশনে নামা হয়নি। শেষে অগ্নিবাণের সঙ্গে মাথামুণ্ডু জংশনে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে চন্‌চনে রোদ মাথায় করে নেমে পড়ে।

নাম তার একটা ছিল, কিন্তু সে নাম বরদাস্ত করতে পারেন নি অগ্নিবাণ ব্রহ্ম। ইচ্ছে মতো নাম ঠিক করেছিলেন, সদাসত্যবান।

এই সদাসত্য বা সত্যবান বাবুর শরীরের ছায়ার মতন। অগ্নিবাণ স্নানের সময় কটা ডুব দেন এবং শোয়ার সময় কতবার তাঁর নাক ডাকে, সব খবর ঠিক রকম নোট করে রাখে সদাসত্যবান।

সত্যবান তার বাবুরই চাকর, আর কারও নয়। তাকে যখন খুশি সদাসত্য বা সত্যবান নামে যেমন তেমন গলায় ডাকা চলে না। ডাকলেও কেউ উত্তর পায় না। গ্রাম থেকে শহরে অগ্নিবাণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এমন কেউ কেউ তো তাকে সদাসত্যবানবাবু বলেই সম্বোধন করেছে!

তবে সদাসত্যের টান ছেলে ছোকরাদের দিকেই যেন একটু বেশি ছিল। ধেড়ে কুকুর বেড়ালের চেয়ে বাচ্চা বেড়াল কুকুরের দিকেই

ছিল তার টান। বাসি রুটি ভাত, মাছের এঁটো কাঁটা এসব যত্ন করে রেখে দেবে এদেরই জন্যে।

ছেলে ছোকরাদের ভরসা ছিল সত্যবান। তাকেই খুঁচিয়ে খবর বার করার ফন্দিফিকির মাথায় ঘুরতে লাগল তাদের। অবিশ্যি কাজটা যে খুব সহজ তা নয়।

বুড়োদের মধ্যে ছদ্মবেশী গুপ্তচর যারা ছিল তারা কেমন করে কোথা থেকে গন্ধ পেয়ে আন্দাজ করেছে ব্যাপারটা। সে কারণে সদাসত্যবানকে খাতির করতেও আরম্ভ করেছে তারা চোরাগুপ্তি।

সদাসত্যও বুঝি টের পায়, অগ্নিবাণের চেয়েও তার খাতির কখন কখন বেশি। একদিন দুপুরের কথা।

বাবুকে পান জল দিয়ে, পায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, পাখার বাতাস দিয়ে, চাপা সুরে ভজন গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে সদাসত্যবান ছোট্ট দুটো বেড়ালছানাকে দুধ আর মাছভাত খাওয়াচ্ছিল আদর করে মুখে বিশ পঁচিশ রকমের শব্দ করে করে। হঠাৎ মাথা তুলে দেখে পাড়ার এক বুড়ো। সদাসত্যর চেনামুখ। বাবুর সঙ্গে অনেকবার দেখেছে তাকে। অনেকগুলো বড় বড় দোকান আছে; চাল ডাল ময়দার। তার বাবু অগ্নিবাণ ব্রহ্মকে কতো রকমের চাল খাইয়েছে। পায়েসের চাল, পোলাও-এর চাল, খিচুড়ির চাল, ঘি-ভাতের চাল সাদা ভাতের চাল!

—তুমি বড় যত্ন করে খাওয়াও সত্য, পশুপাখিও যত্ন বোঝে তোমার,—বুড়ো বলে।

—আদর যত্ন বুঝলে তবে আসে মানুষের কাছে,—গদগদ হয়ে বলে সত্যবান।

—সে কথাই তো বলছি, নাও ধর। বুড়ো সিগারেট-কেস খুলে দামী একটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয় সত্যর দিকে।

সে ভাল করে ঘষে ঘষে জামার হাতায় ডান হাতের তালু মোছে, তারপর জড়ভরতের মতো হাত বাড়িয়ে সিগারেট নেয়। মুখে ধরলে

বুড়ো নিজেই আগুন ধরিয়ে দেয়। বাবুর ভালো তামাকের মতোই সিগারেটের ভুরভুরে গন্ধ, মনে মনে তারিফ করল সত্যবান, মুখেও বলল। বুড়ো খুশি হল না শুধু, ভরসা পেল কোথায়।

—আচ্ছা কথাটা কি সত্যি নাকি, সত্য? চাপা নীচু গলায় বুড়ো জিজ্ঞাস করে।

—কী কথা বাবু? যেন কিছুই বুঝতে পারছে না সত্যবান, এই ভাবে ফিরে প্রশ্ন করে।

—ওই যে গো, টাকা পেয়েছেন তোমার বাবু, অগ্নিবাণ ব্রহ্ম গো।

কিছু বলার আগে এমন বিচ্ছিরি মুখ করল সদাসত্যবান যে বুড়োর মনে হল সিগারেট ভালো লাগেনি সদাসত্যর।

—কী হে তেতো লাগল না কি? বুড়ো আসল কথা ভুলে জিজ্ঞাসা করে।

—না না, ধোঁয়ার ঢেঁকুর উঠেছে। বলে সদাসত্য আবার আরামে টান দেয়।

বুড়ো ভাবল, যাক তবু রক্ষে।

ফুক্ ফুক্ করে ফুঁকে, মুখের ধোঁয়া নাক চোখ দিয়ে ছেড়ে সত্যবান বলল, একটাতে কি আর হয়!

বুড়ো মনে মনে কী ভাবল কে জানে, মুখে বলল, তা নাওনা, বেশ তো, আরেকটা ধরাও না,—এই বলে পকেট থেকে বার করতে যায়।

—আরে না না, রাম রাম, বাবু জানতে পারলে—

সদাসত্যর কথায় বুড়ো একটু ঘাবড়িয়ে যায়, সামলিয়ে নিয়ে বলে ফের, বাবু তোমার দেখছেন কোথায়?

—চোখে নাই বা দেখল, কানে তো যেতে পারে কথা—সদাসত্যবানের কথা ক্রমশঃ কেমন ঘোরাল মনে হল বুড়োর। ভাবল, ঘাঁটিয়ে লাভ নেই, ঘোড়া চাপতে গিয়ে শেষে ঘোড়ার ঠ্যাঙের চোট খাবে। লাভের মধ্যে গেল একটা সিগারেট। যাক তবু কটা পয়সার ওপর দিয়ে! পেলে গিলে খায় আস্ত, মনের ভাবখানা এই, কিন্তু মুখে হাসি-হাসি ভাব রেখে সরে পড়ল বুড়ো।

কথাটা অগ্নিবাণের কানে যায় নি, হয় তো যেতও না, কিন্তু সদাসত্য নিজেই তুলেছে। অগ্নিবাণের পায়ে ডবল মোজা পরাতে পরাতে সত্যবান বলেছে, মানুষের সঙ্গে ভালো মানুষের মতো দুটো কথা বলতে দোষ কী আছে, পান দোক্তা তামাক দিলে তা-ও খাব, তবে কি আর ঘরের কথা হুট্ করে ফাঁস করতে যাব না কি !

আনন্দে অস্থির হয়ে কাঁপতে কাঁপতে অগ্নিবাণ বলেন, হ্যাঁরে সত্য, মাথামুণ্ডু জংশন থেকে তোকে সঙ্গে এনে ভালোই করেছি বল।

—আজ্ঞে তা বলতে, এইটুকু মাত্র বলতে গলা বুঁজে আসে সত্যবানের।

—আচ্ছা তোকে যদি মাথামুণ্ডু জংশনে রেখে আসতুম ?

—এ কথার মুণ্ডুমাথা কিছু বুঝিনা বাবু, ফেলে এলেই হল !

সদাসত্যবানের কথা শুনে ঘাবড়ে যান অগ্নিবাণ ব্রহ্ম।

—যদি মাপ করেন তো বলি। বাবু, আপনার অন্ন যখন খাব তখন অন্যের দাস হই কেন ; তবে নজর রাখতে হয় এদিক ওদিক, হুঁসিয়ার ! আপনার ব্যাগে যদি একখান টিকিট থাকত তো আমার থলেতেই ভরতাম বাবু। আর সেই টিকিটে গাড়ি চেপে সোজা আপনার এখানে এসে উঠতাম। টিকিট চেকারে চেক্ করবার আগে আমি চেক্ করি বাবু।

—তুই কি গোয়েন্দাগিরিও করেছিস না কি ?

—তা আজ্ঞে মাথামুণ্ডুতে আসবার আগে ভাঙা মাথা আর কাটা মুণ্ডু কি একটাও দেখিনি—সব লাইনেই হাত লাগিয়েছি বাবু কিছু কিছু,—বলতে বলতে লজ্জায় মাথা নীচু করল বুঝি সদাসত্যবান।

- ভাবি সত্যি, তুই আমার কপালে টিঁকলি কি করে ! আদুরে গলায় বলেন অগ্নিবাণ।

—যোগসাজস সবই মাথামুণ্ডু জংশনের বাবু, এর মাথামুণ্ডু কোথায় খুঁজে পাবেন !

সদাসত্যবানের প্রভুভক্তির নতুন প্রমাণ পেলেন বুঝি অগ্নিবাণ। মাথায় একখানা হাত রেখে বললেন, আমি কি এত জেনে শুনে তোর

নাম রেখেছিলুম রে! সত্যি কথা বলতে তোর মুখে দেখি একটুও আটকায় না!

বর্ষার বিষ্টি কখন যে নামবে কেউ বলতে পারে না। আকাশের চেহারা পালিশ করা আয়নার মতো ঝক্‌ঝকে, তবু কেউ বাড়ি থেকে পা ফেলার সময় বলতে পারে না মাঝ-রাস্তায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে কি না, কাদা জলে ডাঙার ওপরে সবাই মাছের মতো ভাসবে কিনা।

অগ্নিবাণও বেরিয়েছিলেন সত্যবানকে সঙ্গে নিয়ে ভালমন্দ বাজার করবেন বলে। এই ঘুরে ঘুরে, এটা ওটা নেড়ে চেড়ে, দেখেশুনে কেনাই হল এখন তাঁর কাজ। কাজ বলতে তো আর কিছু নেই এ বয়সে, অফিস থেকে অবসর নিয়েছেন একটু তাড়াতাড়ি। বাতের ব্যথায় বড় বেশি কষ্ট পাচ্ছিলেন। অফিসের কাজে ছুটোছুটি আর পোষাল না তাঁর। তাই সদাসত্যকে নিয়ে বাজার করার কাজেই তাঁর সময় একটু বেশি যায়।

হাতে ছাতা, আগে আগে চলেছেন অগ্নিবাণ, আর পিছনে চাপা সুরে ভজন গাইতে গাইতে তফাতে তফাতে চলেছে সদাসত্যবান, হাতে বাজারের থলে।

বেশ চলেছিলেন অগ্নিবাণ ব্রহ্ম, এমন সময় প্রায় বিনা নোটিশে কেঁপে ঝেঁপে নেমে এল বড় বড় তাজা তাজা লাখ লাখ বিষ্টির ফোঁটা।

অগ্নিবাণ ছাতা খুলতে গিয়েও দেখেন খোলে না, আর চেষ্টা করতে করতে যখন প্রায় ভিজে যান যান, সদাসত্য তড়িঘড়ি করে ছুটে এসে বাবুর হাত থেকে ছাতা নিয়ে খোলে, ছাতার তলায় বাবুর পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। সে গান গাইছিল খেয়ালই ছিল না। বাবুকে নিজের পাশে দেখে নকল কাসি কেসে গান থামাল।

দুজনে কোন রকমে ছাতার নীচে মাথা বাঁচিয়ে চলছিলেন এমনি সময় কোথা থেকে ঝোড়ো কাকের মতো ছাতার নীচে এসে দাঁড়াল এক ছোকরা। দুজনকে প্রায় করাত্ দিয়ে কেটে আলাদা করে মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

—ম'লো যা! রকম দেখ ছোকরার! আমরা ভিজে মরি তো উনি এসে আবার জুটলেন,—খেঁকিয়ে ওঠে সদাসত্যবান।

অগ্নিবাণ দেখলেন বেগতিক, জিজ্ঞাসা করলেন, কতদূর যাবে হে ছোকরা?

—আজ্ঞে, এই একটুখানি পথ, ছাতার তলায় মাথা গুঁজতে গুঁজতে বলে ছেলেটা।

—একটুখানি পথ তো বুঝলাম, তা ঠেলেঠুলে ঢুকছ কোথায় এর ফাঁকে? আমাদেরই মাথা গোঁজার জায়গা নেই তো এসে ঢুকলেন উনি,—সদাসত্য নিজের মনে বলতে থাকে।

অগ্নিবাণ কী ভেবে বললেন, সত্য, আর বাজার হাটে কাজ নেই বাপু, ওই চালের আড়তের চালার নীচে চল দাঁড়াই। এ যে একেবারে ভিজে নেয়ে উঠলাম। কাগজখানা আবার গেল কোথায়—

—কাগজ তো আপনার হাতেই দেখেছিলাম বাবু,—সত্য জড়সড় কণ্ঠে বলে।

—পেয়েছি পেয়েছি, বলে জামার তলায় পেটের নীচে কাপড় আলগা করে 'দৈনিক সংবাদ ভাণ্ডারখানা' আরও শক্ত করে গুঁজে দেন।

টিনের শেডের নীচে চালের আড়তে এসে দাঁড়ালেন অগ্নিবাণ ব্রহ্ম। তারপর ছাতা মুড়ে ভেজা ছাতা সদাসত্যর হাতে দিয়ে, জামার তলা থেকে বার করলেন 'দৈনিক সংবাদ ভাণ্ডার'।

কোঁচার খুঁট দিয়ে মাথা মুখ চোখ মুছে ভেজা-ভেজা 'সংবাদ ভাণ্ডার'খানা চোখের সামনে মেলে ধরলেন ব্রহ্মমশাই।

প্রথম পাতা খুলেই বুঝি চমকে উঠলেন তিনি। বললেন, ভালই হয়েছে রে সদা, বাজারে গিয়ে আর কাজ নেই, বিষ্টি এসে ভালই করেছে।

—সে কি কথা বাবু! বাবুর চেয়েও আরও অবাক হয় ভৃত্য।

—এই তো রে, চাল ডাল নুন তেলের দাম বেঁধে দিয়েছে গবরমেন্ট! অগ্নিবাণের কথা শুনে আরও অনেকে যারা দাঁড়িয়েছিল

শেডের নীচে সবাই মাথা উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে 'সংবাদ ভাণ্ডারে'র খবরের ওপর চোখ রাখার চেষ্টা করল।

অগ্নিবাণ তাড়াতাড়ি কাগজ মুড়ে ফেললেন আর তাই দেখেই বুঝি ছোকরা বলল,—বাবা আজকাল আর বাজারে যায় না।

—তা হলে, তোমাদের বাজার হয় না নাকি? অবাক হয়ে অগ্নিবাণ জিজ্ঞাসা করেন।

—আজ্ঞে, হলেও বাবাকে ঠিক ঠিক দাম বলা হয় না।

—মানে?

—মানে আপনার, বাবাকে বাজার দর ঠিক ঠিক বললে বাবা আর ফিট্‌কাট্‌ থাকবে না।

—ফিট্‌ হবে বলছ, সত্যবানের কথা শুনে অগ্নিবাণ হেসে ওঠেন।

—ঠিক তাই, ছোকরা বলে।

বেশ মজার মনে হল ছোকরাকে অগ্নিবাণ ব্রহ্মের।

—কী নাম তোমার? জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—আজ্ঞে, শিশুপাল।

—বা! বা! অগ্নিবাণ মুখে এ কথা বললেও ভাবলেন, ছদ্মনাম নয় তো?

—আসল নাম ইস্কুলের খাতায় আছে, রোজ যেটা ব্যবহার করি সেটাই আপনাকে বললাম।

—আমি ভাবছিলাম ইস্কুলের নামটাই বুঝি বললে। আমাদের সময় তো ইস্কুলের নামটাই থাকত শক্ত খটমট।

—আজ্ঞে না, বাবা বলে রোজ যে নামে লোকে ডাকাডাকি হাঁকাহাকি করে সেটা মহাভারতের নাম হবে। এই দেখুন না, আমার দিদির নাম সত্যভামা। ইস্কুলের খাতায় নাম আছে আলাদা!

—তা তুমি পড় কোন ইস্কুলে?

—আজ্ঞে এই কাছেই, রানী স্বর্ণসাঁক্‌রাণী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়!

ইস্কুলের নাম শুনে কিন্তু সত্যিই গম্ভীর হয়ে যান অগ্নিবাণ ব্রহ্ম।

ইতিমধ্যে বিষ্টি ধরে এসেছে। ছোকরা এদিক ওদিক চাইতে চাইতে ফুড়ুক্ করে চড়ুইয়ের মতো টিনের শেডের তলা থেকে বুঝি উড়েই নেমে গেল ভিজে রাস্তার ওপর। ওর নামার ভঙ্গি দেখে অগ্নিবাণের মনে হল, সত্যি বেশ একটা বয়স ওদের। আরও তাঁর মনে হল ষাট বছর পার করে দিয়েছেন তিনি। এমন আরও কতো কি ভাবতে ভাবতে বাজারের দিকে চললেন।

—হ্যাঁ রে সত্য, ওই নামে কোন ইস্কুল আছে নাকি রে ?

—আজ্ঞে কত্তা, কেন বলুন তো ?

—একবার খোঁজ নিয়ে দেখতাম।

—কিসের খোঁজ ?

—ওই নামে কোন ইস্কুল আছে কি না। আর ইস্কুলের নাম পেলে ছোকরার নাম পেতে কতোক্ষণ !

—এতক্ষণে বুঝলাম, বলে হো হো করে হেসে ওঠে সদাসত্যবান।

বাজারের থলে হাতে বাবুর পিছু পিছু মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবে, বাবু কিছুই জানতে বুঝতে পারেন না। কতো ছোকরা যে এরকম নিজের ইস্কুলের নাম, নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বাবুর সম্বন্ধে খোঁজ খবর চালাচ্ছে চোখে স্রেফ ধুলো দিয়ে !

সে বাবুকে একটু হুঁসিয়ার হয়ে চলাফেরা করতে বলে।

অগ্নিবাণ এমনিতে সজাগ সতর্ক ব্যক্তি। লোককে সন্দেহ সংশয় করা তাঁর ধাতে নেই। তবে প্রয়োজন মতো এড়িয়ে চলেন। তা ছাড়া সদাসত্যবান হুঁসিয়ার করে দেওয়ার পর থেকে তো আর কথাই নেই।

এই ঝড়বাদলার মাঝখানেই একদিন জোড়া ইলিশ হাতে করে বাড়ি ফিরছিলেন অগ্নিবাণ। রিক্সার খোঁজ করেও মিলছিল না। যাও বা দু একটা পাওয়া গিয়েছিল কেউ পরমার্থপ্রাপ্তিযোগ ষ্ট্রীটের হাঁটুজলের মধ্যে ঢুকতে রাজী হল না। অগত্যা হাঁটতে হাঁটতেই ফিরছিলেন তিনি।

—জোড়া কত নিল ? তাঁরই বয়সী একজন কখন পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, পিছন ফিরে তাকিয়েছেন এ. ব্রহ্ম। ভদ্রলোকের পোষাক উকিলের মতো। কোন উত্তর নেই। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করবার পর আরেকবার পিছন ফিরে অগ্নিবাণ আবার সামনে চলতে চলতে বলছেন—ডান হাতেরটা কম দাম, বাঁ হাতেরটা বেশি।

দাম শুনে ভদ্রলোক চুপ করে থাকেন।

—ইলিশ কি গঙ্গার ?

—একটা গঙ্গার, একটা পদ্মার।

—একটা বেশি চিক্‌চিক্ করছে বটে !

—হ্যাঁ, মরা মাছটাই বেশি চক্‌চকে !

—তাই না কি ? ভদ্রলোক বড় বড় চোখে মাথা নীচু করে মাছ দুটো লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন। যেন কোনটা নড়ছে দেখার ইচ্ছে।

অগ্নিবাণ ব্রহ্মের হাত দুটো সমান নড়ছিল। কোনটা জ্যান্ত ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

—তা ভালো তা ভালো, খেতে ভালই লাগবে, উকিলের পোষাক-পরা ভদ্রলোক এক-গাল হেসে বলেন।

—না না, এ ত খাওয়ার জন্যে নয়, জলে ছাড়ার জন্যে।

—তাই না কি ? খুব আগ্রহ নিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন।

—আজ্ঞে, একটি পুকুরে একটি চৌবাচ্চায়,—খুব বিনয় করে মিহি গলায় বলেন অগ্নিবাণ।

—ব্যাপারটা ঠিক আপনার—

—বুঝলেন না, এই তো ? জ্যান্ত মাছ যাবে পুকুরে আর মরা চৌবাচ্চায়।

—মরা মাছটাও জলে থাকবে ?

—হ্যাঁ, চৌবাচ্চার জলে কিছুদিন থেকে জ্যান্ত হয়ে আবার পুকুরে চলে যাবে। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমন ভাবে হেসে বলেন অগ্নিবাণ ব্রহ্ম।

—মরা মাছ ?

—হ্যাঁ, ভাঙা পুরনো জিনিষ যেমন মেরামত করে নতুন হয়।

—তাই নাকি! কী রকম জল মশাই?

—ও-টা বলব না, কেমিস্ট্রি যাদের পড়া আছে তারা আমার চৌবাচ্চার জলের ফরমুলা বুঝতে পারবে। বাজী মাত্ করার মত করে বলেন অগ্নিবাণ ব্রহ্ম।

—স-ব্ ব না-শ। দরকার নেই মশাই,—উকিলের পোষাকপরা ভদ্রলোক পথের সামনেই যে বাঁকটা পেলেন সে দিকেই পিট্টান দিলেন।

পথে এস—নিজের মনে মনেই বুঝি বলেন অগ্নিবাণ, আর নিজের মনেই বুঝি শব্দ না করে হাসেন।

সদাসত্য তাঁকে খুব হুঁসিয়ার থাকতে বলেছে। কে জানে ইলিশ মাছের কথা থেকে কোন্ কথা শেষে টেনে বুনে বার করে নেবে! সরল মনে আর তিনি লোকজনের সঙ্গে কথাও বলতে পারেন না, বিশ্বাসও করতে পারেন না কাউকে! এমন ছুঁকছুঁকে প্রবৃত্তি নিয়ে সবাই ঘোরা ফেরা করে তাঁর চারপাশে যে তিনি একদণ্ড সুস্থির হতে পারেন না ফাঁকা খোলামেলা মনটুকু নিয়ে!

কিছু না-রেখে-ঢেকে ফলাও করে সব কথা খুলে বললেন অগ্নিবাণ ব্রহ্ম সত্যবানকে বাড়ি ফিরে।

দুটো বড় বড় ঝক্‌ঝকে পালিশ করা ইলিশ দেখে যেমন খুশি হল সত্য, তার চেয়ে বেশি খুশি হল বাবুর এমন কায়দা করে উকিলের মতো লোককে বেকায়দায় ফেলায়।

মন দিয়ে যদি রাঁধে সত্যবান তো বাবুর্চি খানসামা কোথায় লাগে!

—আমাকে আর দিস নে সত্য, সত্যি বলছি আর দিস নে, পেটে আর ধরবে না, এই করতে করতে দেড়খানা মাছ খেয়ে ফেললেন অগ্নিবাণ!

বাবুকে পেট পুরে খাইয়ে-দাইয়ে নিজে খেতে বসল সত্য।

বাবুকে দেড়খানা মাছ খাওয়ালেও, মুড়ো দুটো নিজের জন্যেই রেখে দিয়েছে সদাসত্য। সে মুড়োর খুব ভক্ত। তা ছাড়া বুড়ো অগ্নিবাণ

এই বয়েসে নকল দাঁতে মুড়ো চিবতে গিয়ে এক কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে বসলে সদাসত্যর খাওয়া মাথায় গিয়ে উঠবে।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে চিবিয়ে চিবিয়ে মাছের মাথা খেল। ঢোক ঢোক করে জল খেয়ে যখন বাবুর পায়ের কাছে খাটের নীচে মাথা রাখল সদাসত্যবান তখন বাবু বললেন, সত্য আমার ঘুম এসে গেছে রে।

সদাসত্য তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখে রাখল! অগ্নিবাণ সাধারণত দিনের একের তিন অংশ ঘুমোন। আর এই সময়ের মধ্যে কতবার নাক ডাকে তার নির্ভুল হিসেব আছে সদাসত্যর খাতায়।

সব কিছু এমন ঘড়ির কাঁটার মতো চলে যে ঠিক যে-মুহূর্তে অগ্নিবাণের নাক ডাকা বন্ধ হয়েছে সত্যবানের ঘুমও ভেঙেছে।

ঘড়িতে সময় দেখেছে আবার সত্য। আর সেই সময় থেকে সকাল হওয়া পর্যন্ত বাবুর মাথার কাছে বসে থেকেছে। কত বার কম নাক ডেকেছে তার হিসেব রাখতে হল! একেবারে ভোরের দিকে আবার যখন নিয়মিত নাকডাকা শুরু হল, সদাসত্যর মুখে হাসি ফুটল। কথাটা তো বাবুকে না জানিয়েও স্বস্তি নেই।

অগ্নিবাণ ব্রহ্মের খেয়াল থাকার কথা নয় কতক্ষণ নাক ডাকেনি।

সদাসত্য ব্রেক্‌ফাস্ট নিয়ে এসে কেমন জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে। সত্যর দিকে তাকিয়ে অগ্নিবাণের মনে হল কিছু যেন সে জিজ্ঞাসা করবে। আদুরে গলায় তিনি বলেন, হ্যাঁ রে সত্য কিছু বলবি না কি?

—আজ্ঞে, তেমন ইচ্ছে আছে কত্তা—চোখ নামিয়ে অনুগত ভৃত্যের মতো বলে সদাসত্য।

—তা বলবি তো,—মাখন-রুটিতে কামড় বসিয়ে গলার স্বর অদ্ভুত করে বলেন ব্রহ্ম।

—কাল রাতে বাবু, আড়াইটে থেকে পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত নাক ডাকেনি।

—আড়াইটে থেকে পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত, নিজের মনে মনেই বুঝি বললেন অগ্নিবাণ।

—আজ্ঞে বাবু, ঠিক ওই টাইম।

—ওই টাইম বলছিস, না! ভাবতে লাগলেন অগ্নিবাণ, কি যেন মনে করার চেষ্টা করেন।

সদাসত্যবান এমন কাতর চোখে তাকিয়ে যেন বলতে চায়, মনে করার চেষ্টা করুন বাবু, ঠিক মনে পড়বে।

সত্যিই মনে পড়ল!

—মনে পড়েছে। স্বপ্ন দেখছিলুম সত্য, ব্রহ্মমশাই বললেন।

—স্বপ্ন? কত বড়? বড় বড় চোখ করে সত্য জিজ্ঞাসা করে।

—তা বড় বই কি।

—সে কথা তো ঠিকই বাবু। রাত আড়াইটে থেকে পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত, সত্যবান যুক্তি দেখায়।

—হ্যাঁ, বেশ বড়ই বলতে হবে। তবে একটা কথা সত্য—

—কী কথা?

—কথাটা হল আদেশ পালন করব কি করব না—

—কার আদেশ?

—ভগবানের।

—ভগবানের! অবিশ্যি করবেন, সত্যবান হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

—শিব, স্বয়ং মহাদেব।

—নিশ্চয় করবেন, নিশ্চয়,—নাক কান মলে বার বার জোড়হাত কপালে ঠেকাল সত্য।

—ঠিকই বলেছিস। বাবা ছিলেন শিবের ভক্ত, সর্বনাম ব্রহ্মের নাম হয়ে গিয়েছিল শৈব।

—বটে বাবু, বটে।

—স্বপ্নাদেশের কথাটা তোকে বলা যাক তা হলে।

সদাসত্যবান হাত জোড় করে বসল বাবুর পায়ের কাছটিতে।

—মনটায় তো শান্তি নেই, বুঝতেই পারছিস ওই ব্যাপারটার জন্য, তাই ঘুমোবার আগেও মনটা ছিল বেশ ভারি। এটা সেটা পাঁচ রকম

ভাবতে ভাবতে চোখ বুঁজেছি। হঠাৎ মনে হল কে যেন মাথায় হাত রেখে ঠেলছে। একবার মনে হল তুই বুঝি। তারপরই ভেবেছি, সত্য হলে পায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকত। তাই মাথা তুলিনি।

—আবার সেই রকম ঠেলা। মাথা তুলে দেখি স্বয়ং বাবা ভূতনাথ।

ভূত! শুধু এইটুকু কানে যাওয়ায় চমকে উঠেছে সদাসত্য।

—মহাদেবের তো হাজার গণ্ডা নাম।

—বলুন কত্তা, কথাবাত্‌তা কী হল।

—হ্যাঁ, সেই কথাটাই তো আসল। বাবা ভূতনাথ বললেন, এত চিন্তা করার আছেটা কি! তোর ওই ব্যাপারটা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর তো কিছু নেই। তুই নিজে বুড়ো হয়েছিস; বুড়ো বয়সের সুবিধে যেমন আছে, অসুবিধেও কি কিছু কম! তাই অনেক ভেবে চিন্তে কথা বলতে হবে, কাজ করতে হবে, বুঝে সুজে হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে। ভাবলুম একবার বলি বাবা ত্রিকালেশ্বরকে, কেমন হুঁসিয়ার হয়ে চলছি তা যদি তুমি জানতে বাবা!

—বুড়ো লোকেরা যেমন ছোটদের মনের কথা বুঝতে পারে, তেম'ন বাবাও বুঝি বুড়ো লোকেদের মনের কথা ধরতে পারেন।

—মুচকি হেসে বললেন, আর তোকে হুঁসিয়ার থাকতে হবে না। তোর টাকা যার হাতে যাবে তার দেখা তুই পেয়ে গেছিস।

—আমি তো খুব অবাক হয়ে গেলুম, সে কি বাবা পেয়ে গেছি!

—বাবা বৃষেশ্বর আগের মতো মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ যা বলেছি, পেয়ে গেছিস।

—কে সে বাবা কুটিলেশ্বর? আমি তক্ষুনি পা জড়িয়ে ধরে বললুম।

—তা বলব না। শুধু নাম বলে দিচ্ছি। তুই খুঁজে নে। ভাল করে দেখেশুনে বাজিয়ে নে। তোকে শুধু নাম বলব না,—কি যেন ভাবলেন বাবা ত্রিলোচন, ভেবে বললেন, একখানি ছবিও দেখাচ্ছি। দেখে মনে কর দিকি, কোথাও দেখেছিস কিনা, চিনতে পারিস কি না।

—কী নাম বাবা?

—আগে ছবি দেখে নে। বাবা মন্মথ একটি ছেলের ছবি দেখালেন। ছবিটা চোখের সামনে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন।

—চিনতে পারলেন বাবু ছোকরাকে? সদাসত্যবান জিজ্ঞাসা করল একটিবার।

—না রে সত্য, অনেক সময় নিয়ে দেখেও চিনতে পারলাম না। তবে চেনা চেনা লাগল।

—কী বললেন বাবা জটিলেশ্বরকে? জিজ্ঞাসা করল সত্য।

—ওই তোকে যা বললাম সেই একই কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, এবার নামটা শুনি বল বাবা।

—নীলকণ্ঠ খুব চাপা কণ্ঠে আস্তে আস্তে কানে কানে বললেন যেন, গম্বুজ চৌধুরি।

—কি বললে বাবা, আরেকটিবার দয়া করে বল।

—গম্বুজ চৌধুরি। এমন করে বললেন বাবা কৈলাসপতি যে এখনও কানে লেগে রয়েছে। আমি বাবার পায়ে গড় হয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, ছবিখানা দিয়ে যাও বাবা, এমনি সময় সব কোথায় হাওয়া, বাবা ভোলানাথ তো খোলাপথ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, আর ছবিখানাও নিয়ে গেলেন।

—ছবি তো আপনি পেতেন না বাবু! সত্য সব শুনে বলল।

—কেন বলছিস এ কথা?

—বাবু, দেবাদিদেব তো আপনাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, ছবি আপনি কেমন করে পাবেন? কানে নাম যেতে পারে, তবে ছবি যদি পান তো সে স্বপ্নেই পাবেন।

অগ্নিবাণ সদাসত্যর কথাগুলো শুনে বুঝি রীতিমত ভাবলেন আর মনে মনে তারিফ করলেন ওর বুদ্ধির।

—কেমন চেহারা বলুন তো বাবু ছেলেটার? এন্কোয়ারী করার মত জিজ্ঞাসা করল সত্যবান।

অগ্নিবাণ গম্বুজ চৌধুরিকে ছবিতে যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমন

বর্ণনা দিলেন। গম্বুজ চৌধুরির বর্ণনা শুনে সত্যবান সেই যে চোখ বুঁজে মুখ বন্ধ করেছে আর হাঁ-ও করে না, চোখের পাতাও খোলে না।

সদাসত্যবানের এরকম অবস্থা হলে বুঝতে হবে সে গভীর কোন চিন্তায় ধ্যানস্থ। ভৃত্য হলেও অগ্নিবাণ এ সময়ে প্রভুর মতো ব্যবহার করতে পারেন না তার সঙ্গে। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, অপেক্ষা করেন, কখন সত্য কথা বলবে, চোখ মেলবে।

এর আগে সর্বনাম ব্রহ্মকে একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন। বাবা বহুদিন গত হয়েছেন। মনে পড়ে না তাঁর কথা। কিন্তু, সে রাতে কী আশ্চর্য পাখির মতো মস্ত বড় দুখানা ডানায় ভর দিয়ে নেমে এলেন সর্বনাম। ঘরের জানালার মধ্যে দিয়ে ঢুকে একেবারে অগ্নিবাণের শয্যার পাশটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর কানে কানে দু চারটি কথা বলে আবার মস্ত ডানা দুখানা মেলে চক্ষের নিমেষে উধাও হলেন আকাশ পানে।

পরদিন সকালে অগ্নিবাণ সদাসত্যকে এসব কিছুর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। ঠিক এই অবস্থায় সেদিনও বসেছিল সত্যবান। চোখ বন্ধ করে আর মুখ বুঁজে।

তারপর চোখ খুলে বলল, মানুষেরও খুব শিগ্‌গির পাখা গজাবে, এ কথাই বড় কত্তা আপনার কানে বলে গেলেন।

আর ঠিক এর কটা দিন পরেই খবর কাগজে বড় খবর পাওয়া গেল। মানুষ রকেটে চাঁদে পাড়ি দিয়েছে।

সদাসত্য মস্ত বড় হাঁ করে মুখ খুলল, তারপর চোখের পাতা মেলল। অগ্নিবাণ শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নিশ্চয় কিছু একটা বলবে সত্যবান।

—কী দেখলি সত্য? অগ্নিবাণ বলেননি কী বুঝলি সত্য। অগ্নিবাণ যা ভেবেছেন তা ঠিকই, সদাসত্যবান দিব্যদৃষ্টি মেলে দেখছিল।

—আজ্ঞে ছোকরা হল গিয়ে আপনার শিশুপাল। ব'লে সদাসত্য মুচকি হাসল।

—কী বললি? ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্ম মশাই।

—আজ্ঞে কত্তা, গম্বুজ চৌধুরি হল গিয়ে আপনার শিশুপাল।

২

—শিশুপাল !

. —আজ্ঞে।

—সে কে ?

—কত্তা, ঝড়বাদলের দিনে যে ছোকরা চালের আড়তের শেডের নীচে দাঁড়িয়েছিল।

—কে বলত কে বলত....

—আজ্ঞে রানী স্বর্ণস্যাকরানী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের ইস্টুডেন্ট ! বুঝিয়ে পরিষ্কার করার মত বলল সদাসত্য।

—ওহো হো, বুঝেছি, এক গাল হেসে বললেন অগ্নিবাণ।

—এবার কত্তা চলুন, খুঁজে বার করা যাক।

—তা তো করতেই হবে সত্য। তবে একটা কথা, কথাটা যেন চাপা থাকে, বিশেষ করে বুড়োদের কাছে।

—সে কথা আর বলতে বাবু ! সদাসত্যবান দু'হাত তুলে দু'কান চেপে ধরে এমন করে যেন নিজের কানেই তুলতে চায় না কথাটা।

অগ্নিবাণের কথামত সদাসত্য একাই বেরিয়ে পড়ল। সে আগে একাই ঘোরা ফেরা করে খোঁজ খবর চালাবে তারপর তার বাবু অগ্নিবাণ যা করবার তাই করবেন। সদাসত্য রানী স্বর্ণস্যাঁকরানী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বানান করে নামটা পড়ল, তারপর নিজের মনেই বলল, ঠিক আছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু লক্ষ্য করল সত্যবান। আর তাকে কেউ লক্ষ্য করছিল কিনা তাও লক্ষ্য করল।

ছুটির ঘণ্টা বাজল। অন্য সব ঘণ্টার চেয়ে এর আওয়াজ ভিন্ন। সদাসত্যর মনটাও আনন্দে কেঁপে উঠল।

একে একে, দলে দলে, এঁকে বেঁকে, দুলে দুলে ছেলেরা স্কুলের বড় গেট দিয়ে নানান পোষাকে নানা ঢঙে, কত রকম কথা কত ভঙ্গিতে বলতে বলতে বেরিয়ে আসতে থাকে।

এতক্ষণে সদাসত্যর নজর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ছেলের দলের ভিড়ের মাঝখানে তার চোখ জোড়া কাকে খুঁজতে লাগল।

অনেকক্ষণ একই ভাবে তাকিয়ে রইল সত্য এক দৃষ্টে, চোখের পাতা না ফেলে। এই ভাবে স্কুলের গেটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে সামলে নেয় নিজেকে।

সদাসত্য দেখল শিশুপাল কাঁধে বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে হাত পা নাড়তে নাড়তে জন দুই ছোকরার সঙ্গে আলাপ করতে করতে স্কুলগেটের বাইরে পা দিচ্ছে। শিশুপালের হাত পা নড়া যেমন দেখল সত্য তেমনি তার মুখের কথা কান পেতে শোনার ইচ্ছে হল।

শিশুপালের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করল সত্য ইংরেজিতে কী যেন লেখা ব্যাগের পিঠে। বাবুর কাছে কাজ করতে এসে ইংরেজি অক্ষর শিখেছিল, তাইতে বুঝতে পারল, জি. সি লেখা রয়েছে।

মনে মনে অনেক কিছু সাত পাঁচ ভাবতে লাগল সদাসত্যবান। আহা, যদি শিশুপালের ব্যাগের একখানা বই খুলে সে বাংলায় তার নামটা পড়তে পারত একটিবার!

এই রকম ভাবছিল যখন, তখন হঠাৎ খেয়াল হতে দেখে একখানা চলন্ত বাসের পা-দানিতে পা রেখে ধাঁ করে চোখের সামনে দিয়ে শিশুপাল আধঝোলা অবস্থায় বেরিয়ে গেল।

মনে একটা চাপা দুঃখ থাকলেও লাভ যে কিছু একটা হল সেটা টের পেল সত্যবান।

ফেরার পথে সদাসত্য তাই বার বার মনে করতে লাগল শিশুপালের মুখখানা। মুখ নেড়ে নেড়ে কী ভাবে কথা বলছিল প্রাণের বন্ধুদের সঙ্গে। কেমন করে পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে পা ফেলছিল, হাত পা নাড়ছিল। আর শেষকালে চোখের পাতা পড়তে না পড়তে ধাঁ-করে বাসে চেপে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত উধাও হল।

বাবুর কাছে বুঝি পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সত্য মনে মনে। একটি কথাও বেঠিক বললে চলবে না। কত্তা বলেছেন, তোর কাছ থেকে ঠিক ঠিক খবর পেলে তবেই আমি হদিশ করতে পারব সব। তুই যত খাঁটি খবর দিবি আমি কাজে তত বেশি সুবিধে করতে পারব, বুঝলি সত্য। এক আধ দিনের কাজ নয় এটা, অতএব—

খবর নিয়ে বাড়ি ফেরার পর সত্য দেখল কর্ত্তা গালে হাত দিয়ে আকাশ পাতাল সাত সতেরো চিন্তা করছেন। কখন যে সদাসত্য পায়ে পায়ে কাছটিতে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করতে পারেন নি।

তারপর যখন হুঁশ হয়েছে, মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, এই যে এসে গেছিস! বল সত্য, খবর কি বল।

সত্য পোষা জানোয়ারটির মত বাবুর পায়ের কাছটিতে জায়গা করে নিল, তারপর গুছিয়ে গুছিয়ে একটি একটি করে শিশুপালের সমস্ত কাহিনী বাবুকে শোনাল। রানী স্বর্ণস্যাঁক্‌রানী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড থেকে ছাত্র শিশুপালের কথা— সব কিছু মনোযোগ দিয়ে শুনলেন অগ্নিবাণ। কত কিছুই না ভাবলেন। সত্য দু চারটে কথা বলতে গিয়েছিল, বাধা দিলেন অগ্নিবাণ, বললেন, তোকে যা জিজ্ঞাসা করি তা বলিস, যা জিজ্ঞাসা করি না তাও বলিস, এই তোর এক দোষ সত্য।

লজ্জা পেয়ে সদাসত্য থামল।

দু চারটি মুহূর্ত থেমে ফের বললেন অগ্নিবাণ খুব শান্তকণ্ঠে,—তোর রিপোর্ট থেকে একটা দরকারী খবর যা পেলাম তা হল গম্বুজ চৌধুরির দেখাই তুই পেয়েছিস।

—বাবু, এ যে একেবারে বাবা ভূতনাথের কথাই আমাকে বললেন!

—জি আর সি এ দুটো লেটার যদি তুই ঠিক দেখে থাকিস তবে ব্যাগটা গম্বুজ চৌধুরির। তবে ছাখ, আরও দেখে শুনে বাজিয়ে নিতে হবে। পা ফেলতে যেন ভুল না হয়। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে চলতে হবে। তুই আগে আরও কিছুদিন খোঁজ খবর চালা তারপর আমি আছি।

হঠাৎ কি ভেবে অগ্নিবাণ সদাসত্যকে বললেন, লেখ তো রে সত্য অক্ষর দুটো, দেখি তুই চিনিস কি না।

বলা মাত্র সত্যবান পাতা জুড়ে লিখে দেখাল অক্ষর দুটো। একটা জি আর একটা সি।

—সত্যি সত্যিই বলছি রে সদা, আমার মত ভাগ্যবান মনিব আর

কে আছে জানি না। বাজিয়ে নেওয়াটা আজকাল একটা স্বভাব হয়ে গেছে। কি অবস্থার মধ্যেই যে আছি না। তোকেও আজকাল বাজিয়ে নিচ্ছি, কিছু মনে করিস নে বাবা!

—আজ্ঞে কত্তা এ সময়ে বাপ ছেলেকেও বাজিয়ে নেয়। কথাগুলো বলে সদাসত্য পরম আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত বাবুর পা থেকে ডবল মোজা খুলতে থাকে।

চোখ দুটি বুঁজে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন অগ্নিবাণ। বেড়ালের মতো আধবোঁজা চোখ মিট মিট করে মেলে 'সংবাদভাণ্ডার'খানার ভাঁজ খুলতে থাকেন। সকালের টাটকা খবর সন্ধেবেলা মিইয়ে আসে। আজকাল নানা ভাবনা দুর্ভাবনায় সকালের খবর সূর্য্যাস্তের পর পড়ার সময় পান। তাঁর বাবার আমল থেকে 'সংবাদভাণ্ডার' তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত রাখা হয়। অন্য কোন নিউজপেপারের খবর তাঁর বিশ্বাস হয় না। তা ছাড়া এমন সব মজার মজার খবর ছাড়ে এরা যা ভূ-ভারতে কেউ কোন কালে বিশ্বাস করতে পারেনি, পারবে না; তবু না-পড়ে উপায় নেই। কোথায় কোন দেশে কাকেদের রং সাদা হয়ে যাচ্ছে, কোথায় গরুমাহষের সঙ্গে নেকড়ের বাচ্ছারাও একসঙ্গে মাঠে চরছে, কোথায় খাল বিল ডোবায় এত জল জমতে শুরু করেছে যে শিগ্‌গির সমুদ্র হয়ে যাবে, কোথায় সাড়ে আড়াই বছরের একটা পেটুক ছেলে দেড় ঘণ্টা ধরে মোরগ মসাল্‌লা খেয়েছে, কোথায় কুতুব মিনারের মত লম্বা একটা গম্বুজ গত মহাযুদ্ধের পর থেকে দৈনিক সিকি ইন্‌চি করে বেঁটে হয়ে যাচ্ছে, এই রকম আরও অনেক, নিত্য নতুন সংবাদ। কোন কাজ যখন থাকে না, খুব বেশি কুঁড়েমি করতে সাধ যায়, কোন রকম ভাবনা চিন্তা থাকে না, কিম্বা ভাবনা চিন্তা থেকে মাথাটা ফাঁকা করতে ইচ্ছে হয়, সেই সব সময় অগ্নিবাণ এই সব খবর মুখরোচক খাবারের মতো গিলতে থাকেন।

মাঝে মাঝে সদাসত্যকেও পড়িয়ে শোনান। বাবুর মতোই সে এসব কিছুর সমঝদার। মাথা নেড়ে হেসে বলে, বাবু কাগজ ছাপুন, এমন সব খবর জোগাড় করে আনব না—ভোরে কাঁধে নিয়ে কাগজ ফিরি করতেও বেরিয়ে যাব।

— কথাটা তুই মন্দ বলিসনি সত্য, তোর ভরসায় সবই করা চলে, বলতে বলতে মজাদার খবর আর কোথায় লুকিয়ে আছে খুঁজতে থাকেন অগ্নিবাণ ব্রহ্ম।

পরের দিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল সদাসত্য। স্কুল বসবারও আগে। চানাচুরঅলা সেজে সত্য স্কুলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই। এমন চোখে ছেলেরা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল যে সত্যর মনে হল সে নিজেই নিজেকে চিনতে পারবে না।

চানাচুর অ্যায় চানাচুর
গন্ধে পবন করে ভুর ভুর
যে খাবে তার সয় না সবুর
খানেওয়ালা করে ঘুর ঘুর।

সত্য কত রকম গলা করতে লাগল। ছেলেরা এর আগে এই চানাচুরঅলাকে দেখেনি। তারা নতুন মজা পেল। কেউ কেউ কিনতেও লাগল।

সত্যবান থেকে থেকে আবার গলা ছাড়ল

চানাচুর অ্যায় চানাচুর
খুশিতে মন ফুরফুর
গানে দোস্ত লাগা না সুর
যে খাবে তার সয় না সবুর।

সত্য রীতিমত মজা পেল যখন শিশুপাল আরও দু'চার জন ছোকরাকে নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। সত্যবান যা বলছিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু চার বার বলল।

শিশুপাল সদাসত্যর কাছ থেকে চানাচুর কিনল, দেখাদেখি তার বন্ধুরাও। সত্যর চোখ ছিল শিশুপালের পিঠের ওপর ঝোলা ব্যাগের ওপর। সত্য আজও দেখল ব্যাগের পিঠে পরিষ্কার লেখা জি আর সি। সত্য তার বাবু অগ্নিবাণের দেওয়া কপিবুক থেকে জি আর সি অক্ষর দুটো মিলিয়ে নিল।

খুব কাছ থেকে দেখল গম্বুজকে ; যা ! মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেছে, এখনও ভালো করে মিলিয়ে নেওয়া হয়নি সব. খুব কাছ থেকে দেখেছে শিশুপালকে। আজও ইচ্ছে করছিল শিশুপালের ব্যাগ থেকে একখানা বই চেয়ে নিয়ে বাংলায় তার নিজের হাতে লেখা নামটা বানান করে করে পড়ে। কিন্তু চানাচুরঅলা সেজে সেটাতো সম্ভব নয়। তাই মনের ইচ্ছেটা চেপে রাখল সত্যবান।

বাড়ি ফিরে আজও সদাসত্য দেখে বাবু গম্ভীর মুখে শুয়ে কতো কী যেন ভাবছেন !

সত্যবানের দিকে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি চোখের পাতা দুটো বুঁজে ফেললেন। কত্তা খুব বেশি রাগ না করলে এমন করে তো তাকে দেখে চোখ বন্ধ করেন না কখনো। কোথায় কী গোলযোগ ঘটেছে মনে করবার চেষ্টা করল সত্যবান বাবুর বুক পকেটের চেনে বাঁধা ঘড়ির দিকে তেত্রিশ সেকেন্ড ঠায় তাকিয়ে। পকেট থেকে মাথা বার করে ঘড়িটা যেন সত্যবানের দিকেই তাকিয়েছিল।

চোখ খুলতে খুলতে একবার বন্ধ করলেন অগ্নিবাণ, তারপর স্পষ্ট করে দুটি চোখ খুলে আরও স্পষ্ট করে তাকালেন সদাসত্যবানের দিকে। যেন চিন্তাই করতে পারেননি চোখ মেললেই দেখতে পাওয়া যাবে সত্যকে সামনে।

সত্য বাবুর চোখে চোখ রাখতে পারল না। কারণ বুঝতে পারছিল না, বেশিক্ষণ দুপায়ে ভর রেখে দাঁড়াতে পারবে কিনা।

সত্য আশা করছিল এবার নাম ধরে কত্তা গলা থেকে একটা শব্দ বার করবেন যে আওয়াজ বহুদিন সে শোনেনি।

কিন্তু আশ্চর্য ! মানুষ কাঁদবার আগে যেমন ধরাগলায় কথা বলে সেই রকম আধা-অস্পষ্ট গলায় দু-বার ডাকলেন, সদা....সদাসত্যবান।

নামডাকার ধরনেই বুঝতে পারে সত্য।—যে বাবু শুধু সত্য বা সদাসত্য ছাড়া কিছু ডাকেন না, তিনিই গোটা নামটা গলা থেকে বার করছেন ! রাগের এর চেয়ে ভাল প্রমাণ আর কি থাকতে পারে !

সদাসত্যর তাই মনে হল এর চেয়ে কত্তা শুধু যদি বাঘ

সিংহির গলায় ছোট নামে ডাক ছাড়তেন—সত্য, তো এর চেয়ে ভালো ছিল।

সদাসত্যকে আর ভয়ে বেশিক্ষণ বাবুর পকেটঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে হলনা (ঘড়ির শব্দ যেমন জোর টিক্‌টিক্ করছিল কাঁটা দুটোও তেমন চিক্‌চিক্ করছিল), অগ্নিবাণ স্কুলের হেডমাষ্টারের গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, বিকেল তিনটে বেজে চুয়াল্লিশ মিনিট সাড়ে আড়াই সেকেন্‌ডের সময় তুমি কোথায় ছিলে, সত্য?

সত্যবানকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্ম মশাই—মানে, তুমি কি স্বর্ণস্যাঁক্‌রানির সামনে ছিলে?

—আজ্ঞে কত্তা সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের দোরের সামনে ঠায় দাঁড়িয়েছিলুম! চানাচুরঅলাকে দেখেন নি?

—চানাচুরঅলা? যে রকম গলায় আওয়াজ ছাড়লেন অগ্নিবাণ তাতে মনে হল রাগ ছেড়ে তিনি সত্যি এতক্ষণে অবাক হয়েছেন।

—আজ্ঞে কত্তা, অবাক হন কেন? সত্য চানাচুরঅলার গানটা আবার গেয়ে শোনাল বাবুকে।

অগ্নিবাণ এইবার একটু একটু করে হাসতে হাসতে হাতের কাছ থেকে সংবাদভাণ্ডার খানা তুলে নিয়ে মুখে চাপা দিয়ে মাথা ঢেকে শব্দ করে হাসতে লাগলেন, শেষে হাসি মিলিয়ে যাবার আগেই বললেন, খুব ঠকালি সত্য যা হোক!

কথা রইল পরের দিন কত্তা নিজে যাবেন রানী স্বর্ণস্যাঁক্‌রানী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ে গম্বুজ চৌধুরির সঙ্গে দেখা করতে।

সে কর্তা অগ্নিবাণকে রাস্তার নাম, অর্দ্ধচন্দ্রার্দ্ধনক্ষত্রত্রয় বাই-বাইলেন এবং স্কুলের ঠিকানা, চারশো সাড়েবিশ বাই শূন্য দশমিক Jo Jo এই নম্বর বলে, সব কিছু বুঝিয়ে বলে কয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হল।

—ঠিক দেখে শুনে যেতে পারবেন তো কত্তা?

—কী যে বলিস সত্য, বাবার দেওয়া নামটাকেও কি অবিশ্বাস করবি না কি একদিন?

—কোন নামটা বাবু?

—মানে ?

—আজ্ঞে কত্তা অনেক গুলো নামই তো আছে।

—কী করে জানলি ?

—চিঠিপত্তর যা আসে তাইতেই দেখি। বাংলায় পড়ে যা বুঝি তাইতেইতো এক কুড়ি, এ ছাড়া ইংলিসে বাবু কি আর কম আছে !

—ভুলিসনে সত্য তোর বড় কত্তার আসল নাম ছিল মহিমময়, আমি তাঁরই পুত্তুর।

—সে কি ভোলার কথা বাবু ! এই দেখেন না আমার নাম থেকেই কম করে চারটা নাম বেরোয়।

খুব জোর বেঁচে গেছে, বুঝতে পারে সত্য। আর এ নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি নয়। মাথা নিচু করে মিহি গলায় বলে, আর দেরি নয় বাবু, বেরিয়ে পড়েন, শী দুগ্‌গা, শী দুগ্‌গা। সদাসত্য দেখল অগ্নিবাণ ব্রহ্ম বাজার করার থলির মধ্যে কাগজ পত্তর কী সব ঠেসে, আরেক হাতে ছাতা নিয়ে, শেষে ছাতা আর থলি সুদ্ধ জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে সত্যিই বেরিয়ে পড়লেন।

বাবু বেরিয়ে যাবার পর কিন্তু সত্য চিৎপাত হয়ে কতো কিছু যে ভেবে ফেলল তা সত্যর নিজেরই মনে রইল না যখন সে আবার সোজা হয়ে উঠে বসল।

কোন দরকারী কাজে বাইরে বেরোলে অগ্নিবাণের কথা ভেবে ভেবে সদাসত্য চুপচাপ থাকতে পারে না। একটা কিছু করার জন্যে উসখুস করবে। না-করতে পারলে নাক সুড় সুড় করে, কান কট কট করে, পেট খাই খাই করে, আরও কত রকমের !

আপাতত চোখ পিট পিট করে এদিক ওদিক চেয়ে সত্য কী খুঁজল। সত্যর মনে পড়ল গত কালের সংবাদ ভাণ্ডারখানা একবার দেখা দরকার। এ সপ্তাহের রাশিফল আছে। পাছে কোথাও হারিয়ে যায়, ভুলে কেউ ছিঁড়ে ফেলে এই ভয়ে সত্য চালের বস্তার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। সংবাদ ভাণ্ডারের মতো চালের বস্তাও আবার লুকিয়ে

রাখা হয়েছে ছাদের মাথায় জলের ট্যাঙ্কের পিছনে। বাবু ব্যাকে স্টক্ করেছেন।

সত্য তাড়াতাড়ি লাফাতে লাফাতে বাড়ির পোষা বেড়ালের মতো ছাদে উঠে এল।

ট্যাঙ্কের পিছন থেকে চালের বস্তা থেকে সদাসত্য সংবাদ ভাণ্ডার বার করল দুটি হাতে চাল সরাতে সরাতে।

তারপর কাগজ খুলে রাশিফলের জায়গা বার করে বাবুর রাশি মনে করার চেষ্টা করল। বৃশ্চিক রাশি।

বৃশ্চিক রাশিতে লেখা আছে : পথে ঘাটে সাবধানে পা-ফেলার দরকার, শত্রুপক্ষ খুউব হুঁসিয়ার, কোন দিক থেকে কী রকম চোট আসবে বলা মুশকিল····অতএব সত্যর ঠিক মনে হল এখন একটি মুহূর্তও বসে থাকা মানে জেনে শুনে বাবুকে···আর এই সঙ্গে মনে পড়ল মাথামুণ্ডু জংশনে তার দুর্দশার কথা। যদি না অগ্নিবাণ সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন সোজা এই কলকাতার পরমার্থপ্রাপ্তিযোগ স্ট্রীটে।

সত্য রেলগাড়ির মতো আস্তে আস্তে স্পীড্ বাড়াল।

প্রায় ঠিক সময়ের একটু আগেই সে অর্দ্ধচন্দ্রার্দ্ধনক্ষত্রত্রয় বাই-বাই লেনে এসে পৌঁছল, তারপর রানী স্বর্ণস্যাক্রানী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের ঠিকানায়, চারশো সাড়ে বিশের বাই শূন্য দশমিক Jo Jo নম্বরে।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা-ধরে গেল সদাসত্যর। অথচ বাবু কখনই বা ঢুকলেন, বেরলেনই বা কখন।

বাবুর বয়সী যাদের সে ঢুকতে আর বেরোতে দেখেছে তারা তো মোটে তিন চার বড়জোর পাঁচ জন হবে! সত্য মনে মনে হাফ্-কাবুলি হাফ-বাঙালি লোকটাকেও গুনতির মধ্যে আনবে কিনা ভাবছিল। মাথার পাগড়ি গোঁফ দাড়ি জরির কোর্তা কামিজের পর ভুঁড়িতে এসে চোখ আটকে গেলে মনে হবে কাবুলি, আবার চোখ মুখ পাগড়ি মাথা এসব কিছু না দেখে যদি ভুঁড়ি থেকে স্টার্ট করে পায়ের নক্সাকাটা খড়ম পর্যন্ত নজর রাখা যায় তো মনে হবে বাঙালি। কিন্তু বাবুর কি সত্যি ভুঁড়ি

আছে, মাথায় কি অতখানি লম্বা ? সত্য শেষে ছেলেমানুষের মতো এই সব ভাবতে শুরু করে।

এর আগে যে তিনজন ঢুকেছেন আর বেরিয়েছেন তাঁরা হলেন, একজন কালোপোষাক পরা উকীলবাবু, একজন হলেন খাকির জামাপরা পুলিশ-পুলিশ চেহারার লোক, আর শেষ কালে বেরলেন এক প্রায়-কুঁজো বুড়োলোক, চোখে ডবল চশমা আঁটা—সাদার ওপর কালো, ঘাড় মাথাসুদ্ধ নুয়ে পড়ছে পায়ের পুরনো ক্যাম্‌বিসের জুতো জোড়ার ওপর। বগলের ছাতা বন্দুকের মতো উঁচনো, হাতের কাপড়ের ঝোলায় কী আছে কে জানে—বোধহয় 'চিন্তামণির দাঁতের মাজন। এসব কথা যখন ভাবছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, সদাসত্য দেখল সেই হাফ-বাঙালি হাফ-কাবুলি লোকটা মুলতানি হিংয়ের বোঁচকা আর মৌমাছিমার্কা খাঁটি মধুর শিশি নিয়ে স্কুলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। মধু না হয় ছেলেদের টিফিনের কাজে লাগবে, কিন্তু মুলতানি হিং ? সত্য কিছু বুঝে পায় না।

স্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে বেরুতে থাকে ছেলের দল। কে আগে বেরুবে কার ঘাড়ে পা রেখে কার মাথা ডিঙিয়ে। এদিক ওদিক উঁকিঝুকি মারাই সার হল। বাবুর টিকিটি মিলল না। দুশ্চিন্তায় পড়ল সদাসত্য। মায় শিশুপাল ওরফে গম্বুজ চৌধুরির দেখাও মিলল না ছেলেদের ভিড়ে। বাবুর নাম করে গলাছেড়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল সত্য। মাথায় হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফুটপাথের ওপর বসে পড়েছিল সে দু-পাঁচ মিনিট। চোখ যখন খুলল, দেখে ছেলেদের আর কেউই নেই। সে একা।

যাওয়ার সময় প্লেনের মতো উড়ল সত্য। এমনকি গম্বুজ চৌধুরির সঙ্গে দেখা না হওয়ার জন্যে একটু আধটু দুঃখ করবে তারও সময় পেল না।

বাড়ি ফিরে সত্যবানের আরও বেশি কষ্ট হল যে শুধু তা নয়, কান্না পেল। বাবু তখনও ফেরেননি। কী ভাববে আর কী ভাবা উচিত নয় কিছু ঠাওর করতে পারল না সে।

কোথাও ঘুমিয়ে পড়লেন, না কথায় কথায় আটকা পড়লেন। কিন্তু এই বয়সে কাজে যখন বার হন বাবু তখন অকাজে তো আটকাবার লোক নন। বাবুর মুখের কথাই তো তার সাক্ষী ; ঘটতে পারে দুর্ঘটনা পড়তে পারে বাজ, ভূমিকম্পে কাঁপতে কাঁপতে সারতে হবে কাজ। কেউ পিছু নেয়নি তো ? বুড়োদের কোন মাইনে খাওয়া গুপ্তচর ?

তার ব্যাপারে বাবু যেমন রাগে চোখ বন্ধ করেছিলেন, মুখ বুঁজেছিলেন সে তেমনি ভয়ে ভাবনায় খাটের পায়া জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

কখন যে অগ্নিবাণ চুপি চুপি এসে ঘরে ঢুকেছেন সত্যর খেয়াল ছিল না।

—কী রে সত্য, সদর হাট করে খুলে রেখে এখানে করছিস কি ? বাবুর কথায় সত্যর এতক্ষণে খেয়াল হল সত্যিই তো দরজা দিতে সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে উঠতে যায়, অগ্নিবাণ বলেন, আমি দিয়ে এসেছি, বস। দোর এমন করে খুলে রাখিসনে ! বাবু যে দরজা দিয়ে আসতে পারেন সে বুদ্ধিটাও তার মাথায় এসে জোটেনা।

—তা ব্যাপার কি বলত, তোর এমন কাঁদ কাঁদ অবস্থা কেন ?

—কাঁদ কাঁদ বলেন কেন কর্তা, চোখ দিয়ে সত্যিসত্যি জল বেরিয়েছিল।

—বলিস কি !

—তা হবে না বাবু ! সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ে যাবেন বলে বেরিয়েছেন, এদিকে····

—এদিকে কিরে ! ওদিকেই তো গিয়েছিলাম—ওই স্যাক্‌রানীর বিদ্যালয়ে।

সদাসত্য এবারে আবাক হয়ে যায়, খুবই রাগ হয় বাবুর ওপর।

—কই কত্তা, দেখলাম না তো—

—দেখলি না কিরে !

—আজ্ঞে কত্তা ঢুকতে কি বেরুতে—

যাদের যাদের ঢুকতে আর বেরুতে দেখেছে তাদের সকলের কথাই একে একে বলল সত্য।

—তবে আমাকেও দেখেছিস—সব শুনে বলেন অগ্নিবাণ, খাটের ওপর এক পা তুলতে তুলতে।

—আজ্ঞে কই মনে তো পড়েনা, সত্যকে খুব কাতর মনে হয়।

—ওরই মধ্যে আমি ছিলুম।

—কোন জনা বাবু? সত্যর গলা শুনে মনে হয় কথাটা কিন্তু এখনও তার বিশ্বাস হয় না।

—আরে আমি বইয়ের ক্যান্‌ভাসার হয়ে ঢুকেছিলুম, অগ্নিবাণ খাটের ওপর পা দুটো মুড়তে মুড়তে বলেন। আর ক্যান্‌ভাসারের কথায় সত্য একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে বলে, কানপাশা কি বাবু?

—রেলগাড়িতে দেখিসনি কানে হাত দিয়ে গলা ছেড়ে হাঁকে—বাতের মালিশ, টাকের পালিশ…

—হ্যাঁ দেখেছি বটে কর্তা, ভীমসেনের গুলি, জ্যান্ত বুলবুলি, যাদুমন্তরের ঝুলি আরও হাজারো রকমের আছে।

—তবে তো জানিস দেখছি।

অগ্নিবাণের কথা শেষ হলে সদাসত্য কটি মুহূর্ত মনে করার চেষ্টা করল সাদার ওপর কালো ডবল্ চশমা আঁটা বুড়ো কুঁজো লোকটাকে। ওই লোকটাই তবে তার কত্তা অগ্নিবাণ ব্রহ্ম!

—পায়ের ধুলো দেন কত্তা পায়ের ধুলো দেন।

—পায়ের ধুলো যখন চাইছিস তোকে একটা গল্পই বলি। আগে একটু চা খাওয়াবি না? সদাসত্য বাবুর স্পেশ্যাল টি-এর অর্থাৎ চায়ের সঙ্গে আফিম আর হজমি গুলির ব্যবস্থা করতে গেল, অগ্নিবাণ সত্যি মিথ্যে সমান পরিমাণে মিশিয়ে একটা কাহিনী ফেঁদে ফেললেন।

সত্যবান চা নিয়ে এলে চায়ের পেয়ালায় অগ্নিবাণ এমন একটি চুমুক মারলেন যে সত্য ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, সামলে বাবু সামলে, জিবে ফোস্‌কা পড়ে যাবে যে!

—ভয় নেইরে সত্য, দিনকাল যে ভাবে এগিয়ে চলছে তাতে শীঘ্রি

দেখবি ফল্‌স্ টিথের মতো ফল্‌স্ টান্‌গ্‌ও বেরিয়ে যাবে, নকল জিব রে! হোল্‌ড ইয়োর টান্‌গ্ আর হোল্‌ড ইয়োর ফল্‌স্ টান্‌গ্ দু-ই চলবে।

—গল্পটা বলেন কর্তা, সত্য বাবুর কথা সবটুকু বুঝতে না পেরে বলে।

—গল্প মানে কি, আমার নিজেরই গল্প। লেখাপড়া শেখার পর বাবা বললেন, এখন তুমি কী করতে চাও? আমি জর্জ ওয়াশিংটনের মতো সাহস করে সত্যি কথাটা বলে ফেললাম, স্টেজে নামতে চাই; বুঝলি তো শহরের লোকেরা যে যাত্রা করে তাই আর কি। বাবা সর্বনাম খুবই খুশি হলেন। বললেন, বেশ! এর জন্যে কী করতে হবে? আমি বললুম, শা-জাহানের এক সেট পোষাক কিনে দাও। তাই হল, নকল গোঁফ দাড়ি চুল, জরির টুপি, রেশমী কামিজ কোর্তা নাগরাই এইসব। তারপর একদিন শা-জাহান করতে করতে লোকে আসল নাম ভুলে ওই নামেই ডাকতে শুরু করে দিল। পুরনো কাগজ পত্তরে দেখবি আমার নাম ছাপা হত শ্রীশা-জাহান ব্রহ্ম, এমন নামডাক হয়েছিল যে আসল নামই লোকে ভুলে গিয়েছিল।

একদিন হল এক কাণ্ড। একেবারে শা-জাহানের যমজ ভাইটি হয়ে নেমেছি স্টেজে। জোর হাততালি পড়ছে। হঠাৎ এক ফুঁয়ে কে যেন হাততালি বন্ধ করে দিল। কী ব্যাপার কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। পায়ের দিকে নজর পড়তে দেখি মাথার টুপি একপায়ের নিচে চেপে আছি, আর এক পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে পাগড়ি গোঁফ দাড়ি। সে এক হৈ রৈ কাণ্ড। সবাই ঘুষি পাকিয়ে হাত উঁচু করেছে, পয়সা ফেরত দাও, না-হলে শা-জাহানের মুণ্ডু চাই! সর্বনাশ! কী করব না-করব ভাবার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। এমন সময় কে যেন কানে কানে বলে দিল আর আমি আওড়ে গেলাম

পরে দাড়ি টুপি
অতি চুপি চুপি
স্টেজে নামলেন শা-জাহান
টুপি নাড়াতেই দাড়ি নড়ে গেল
দু-পা বাড়াতেই টুপি পড়ে গেল

মেক্‌-আপের ত্রুটি তাড়াতেই
না কি
জোড়হাতে শেষে ক্ষমা চান

মাথা নিচু করে ক্ষমা চেয়েছি। আর মাথা তোলার পর কোথায় পয়সা ফেরত দাও ....অন্য চিৎকার শুনলাম, হাইক্লাস হাইক্লাস.... আরেকবার দাদা আরেকবার....আবার বললুম, বলে মাথা নিচু করে ক্ষমা চাইলুম। কে যে কানে কানে প্রম্‌প্‌ট করেছিল আজও জানতে পারিনি রে সত্য।

—বাবা তারকেশ্বর বাবু তারকেশ্বর, যিনি আপনার কানে কানে শিশুপালের আসল নাম বলে দিয়েছেন, এই বলে সদাসত্য চোখ বুঁজে দু হাত জোড় করে বার বার কপালে ঠেকাল।

তারপর চোখ খুলেই বলে, পায়ের ধুলো দেন বাবু। আমি সাজলাম চানাচুরঅলা আর আপনি কানপাশার, সদাসত্য বারবার অগ্নিবাণের পায়ে হাত দিল আর হাত তুলে মাথায় ঠেকাল।

—কানপাশার নয় রে ক্যানভাসার! সবচেয়ে বড় খবর কি জানিস, গম্বুজকে সোজা বাড়িতে নিয়ে আসছি, এই পরমার্থপ্রাপ্তি-যোগ স্ট্রীটে, বলে অগ্নিবাণ পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মাথা দোলাতে থাকেন।

—তা আমি চানাচুরঅলা হয়ে যদি নাম জোগাড় করতে পারি কত্তা, আপনি কানপাশা হয়ে ছেলেটাকে জোগাড় করবেন এ আর বেশি কথা কি!

—বেশি কথা নয়? বলিস কি! স্বপ্নাদেশ কি যে কেউ পায় রে। আগে আগে তবু অনেকেই পেত, আজকাল যেন জিনিসটা উঠে যাচ্ছে। সেকালের লোক বলেই পেয়েছি বোধ হয়। আর স্বপ্না-দেশে যার নাম পাওয়া গেছে তাকে বাড়ি ডেকে আনছি সে খবরটা বেশি না তো কম! বলিস কি?

অগ্নিবাণের কথা শুনে সদাসত্য নিজের ভুল বুঝতে পারে, বুঝতে পারে বেশি না হোক কমই বা কি। যে-কথাটা জিজ্ঞাসা করা সবচেয়ে

দরকারী সেইটাই জিজ্ঞাসা করল, তা বাবু আনবেনটা কী উপায়ে? ঘুম পাড়িয়ে না ভুলিয়ে ভালিয়ে?

—আমি স্টেজের ওপর শা-জাহান প্লে করি, আমি কি ম্যাজিক দেখাই যে ঘুম পাড়িয়ে আনব? আর ভুলিয়ে ভালিয়ে আনলে দেখতে হবে না, আজকালকার পুলিশ আর লাল পাগড়ি মাথায় দেয় না, কালো চশমার মতো কালো টুপি পরে। টুপি কি মাথার চুল বুঝতে পারবি না। ভুলিয়ে ভালিয়ে আনতে গেলে ঝুলিয়ে ঝালিয়ে দেবে। আমায় তুই ছেলেধরা পেয়েছিস নাকি? নিজের গর্বে নিজেই হাসতে থাকেন অগ্নিবাণ।

—তা কর্তা আপনার মতলবটা কি একটু বলেন, শুনি।

—মতলব যখন একটা আছে তুই শুনবি বই কি। ব্যাগের মধ্যে গাদা খানেক পুরনো বস্তাপচা বই আর তারই সঙ্গে খান চারেক সস্তা নতুন বই নিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করলুম। ব্যাগ বাজিয়ে বললাম, এমন সব বই আছে যা পড়লে ছাত্তরদের মাথা আপনা থেকে খুলে যাবে, মাস্টারদের মাথায় বাজ পড়বে, তারা যা শিখেছে সব ভুলে যাবে আর বাজ-পড়া মাথা নিয়ে আবার সব বই বগলে স্কুলে যাবে। তা-ছাড়া যে-স্কুলে শিশুপাল, আই মিন্ গম্বুজ চৌধুরি আছে সেই স্কুলের ছেলেদের কথাই আলাদা। রানী স্বর্ণ স্যাক্‌রাণীর হেডমাস্টার তো খুব খুশি। বললে, বটে বটে, সে কথা তো খুবই ঠিক —ভে—রি ভে—রি ইন্‌টেলিজেন্‌ট। তবে শেষপর্যন্ত রেসাল্‌ট সামলাতে পারে না। বুঝতে পারলি? সদাসত্যকে প্রশ্ন ক'রে অগ্নিবাণ থামলেন।

—আজ্ঞে কত্তা আরেকটু সহজ করে,—আমতা আমতা করে বলে সত্যবান।

—আচ্ছা আচ্ছা, মানে হল আর কি তোর—ক্লাসে উঠতে পারে না, ফেল করে যায়। আজ্ঞে সেই জন্যেই তো আসা এখানে, আমি চটপট বললাম। আমার ব্যাগে যতো বই আছে সব চালাক চতুর ছেলেদের জন্যে। যারা পড়ে না, ফাঁকি দেয়, কিন্তু একবার যদি পড়তে আরম্ভ করে তবে রোখা দায়। তারাও তো ঠিক মনের মতো বই চায়।

সেই সব বই জোগান দেওয়া হল আমার কাজ। তারপর তো স্বর্ণ-স্যাকরাণীর হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করলেঃ দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে গম্বুজের? বললাম, আজ্ঞে না। নামডাক শোনা আছে তবে চোখে দেখিনি। বসুন, টিফিনের সময় আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছি। যে আজ্ঞে, বলে পেছন ফিরেছি এমন সময় আবার ডাক শুনে ফিরলাম। হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করলে আপনার নামটা কি জানতে পারি? বললাম, আজ্ঞে একবার নয় একশোবার—অগ্নিবাণ ব্রহ্ম! আচ্ছা ব্রহ্মমশাই আপনি যে সব বইগুলোর কথা বললেন তার দু'এক-খানা দেখতে পারি কি? বললাম, আজ্ঞে একখানা কেন একশোখানা দেখুন, তবে আজ তো সব আনিনি। ব্যাগ বাজিয়ে বললাম, পাঁচখানা বইয়ের কুড়ি কপি করে আছে। এই বলে তিনরাত্তিরে জ্যামিতি এক-খানা তুলে নিলাম ব্যাগ থেকে। হেডমাস্টারের হাতে দিলাম। বইয়ের তিনদিক মোড়া, শুধু মলাটের ওপর নাম পড়া যায়। হেডমাস্টার বললে, ব্রহ্ম মশাই এ কি রকম হল, এযে দেখি মুখ আঁটা! বললাম, আজ্ঞে স্যার আমার সব বইতো এই রকমের। কেনা হলে লেখকের কাছ থেকে একটা নক্সা পাওয়া যাবে আর সেই নক্সা মিলিয়ে পড়তে হবে; নক্সা দেখে যেমন আর কি লোকে বড় বড় রাস্তা থেকে অন্ধগলি খুঁজে পায়। আমার হাতে বই ফেরত দিয়ে হেডমাস্টার বলে, এ রকম আর কী কী বই আছে সঙ্গে? আমি বললাম, সাপ্তাহিক সংস্কৃত, দেড়ঘণ্টায় ইংরেজি, পাক্ষিক ভূগোল, ষাণ্মাসিক ইতিহাস—এইরকম আর কি, যেটার জন্যে যে রকম সময় লাগবে। শুনে বলে, আর দরকার নেই। বসুন আপনি। টিফিনের সময় দেখা করবেন গম্বুজের সঙ্গে। দেখা যাক এ সব বইতে যদি কোন ফল হয়, আমরা তো ফেল করে গেছি। নিশ্চয় হবে নিশ্চয়ই হবে, খুব বুদ্ধিমান ছেলেদের জন্যেই তো এ সব বই লেখা হয়েছে, বলতে বলতে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

টিফিনের ঘণ্টা বাজল। দেখা হল আমাদের শিশুপালের সঙ্গে। আমি একপাশে ডেকে নিয়ে বললাম, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে, তোমার বন্ধুদের একটু তফাতে থাকতে বল।

—পায়ের ধুলো দেন কত্তা, সামনের জন্মে যেন কানপাশার হতে পারি। অগ্নিবাণের পায়ে সত্য মাথা ঠেকাতে গেলে অগ্নিবাণ পা সরিয়ে নেন।

—তারপর তো জমিয়ে বসলুম গম্বুজকে নিয়ে। বললাম, পরমার্থ-প্রাপ্তিযোগ স্ট্রীটের গলিতে বসেও তোমার কথা কানে আসে হে, সব কানে আসে। খবর কি চাপা থাকে কিছু? তোমার মতো বুদ্ধিমান ছেলে কি বেশি পড়তে পারে! ঠিক যে-বই তোমার কাজে লাগবে সেই বই আছে আমার কাছে। বলে নাম করলুম আরও দু চারখানা বইয়ের, যেমন—অজ্ঞানের বিজ্ঞান, অঙ্কের লঙ্কাকাণ্ড। খুব মজা পেল গম্বুজ।

—তারপর কত্তা তারপর? যেন তর সইছে না এইভাবে জিজ্ঞাসা করে সদাসত্যবান।

—তারপর আরও অবাক করে দিলাম। বললাম, তোমার বোনের আসল নাম সত্যভামা না? তোমার বাবা তো জিনিসপত্তরের অগ্নিমূল্যর জন্যে বাজারে যান না, সত্যি কি না? তোমার ডাক নামটাও তো মহাভারতের থেকে নেওয়া। শিশুপাল না? জিজ্ঞাসা করল, আপনি জানলেন কি করে? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কি ভাবল। বুঝলাম আমাকে চেনবার কোন উপায় নেই এখন। বললাম, সব খবর রাখতে হয়। খবরের মতো খবর হলে রাখতে হবে বই কি। থাকি না-হয় পরমার্থপ্রাপ্তিযোগ স্ট্রীটের গলিতে তা বলে পাড়ার আরেক মোড়ে কী হচ্ছে না হচ্ছে খবর রাখব না, বল কি হে! তা ছাড়া ছেলের মতো ছেলে হলে শুধু তার বাড়ির কেন, হাঁড়ির খবর রাখব।

—তা তো বটেই কত্তা। তেমন কাজের ছেলে হলে দুটো খবরই দরকার। আপনি কত্তা বাড়ির খবরটা রাখেন, হাঁড়ির খবরটা আমার কাছে থাক।

—দুজনে যখন আছি সে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই, ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে! আগে কথা হল বাড়িতে এলে ভালো করে বসিয়ে

জমিয়ে আলাপ করে নেওয়া। বাড়ি এলে যত্ন করে বসাতে পারবি তো সত্য ?

—আজ্ঞে বাবু, বড়কত্তার আসনখানা পেতে দেব, কত্তামশায়ের রূপোর গেলাশ বাটি মেজে ঘষে রেখেছি, তাইতে খেতে দেব।

—দিস দিস, সত্যবানের কথা শুনে চোখ বুঁজলেন অগ্নিবাণ। আর বাবুর দেখাদেখি সদাসত্যও চোখ বুঁজল। সে জানে বড়কত্তার পুরনো জামা কাপড়, জুতো মোজা, লাঠি ছাতা, গেলাশ বাটি, মায় হুঁকো কল্‌কের কথায় এসে পড়লে, বাবু এ বয়সেও চোখ বুঁজে কত্তামশাইকে মনে করার চেষ্টা করেন। বাবুর দেখাদেখি সত্যও চোখ বুঁজেছে প্রতিটি বার। কিন্তু কোনবারই বড়কত্তাকে দেখতে পায়নি। বাবু চোখ খোলবার আগে সে চোখ পিটপিট করে দেখে নিয়েছে বাবুকে বারকয়েক। তারপর অগ্নিবাণ চোখ খুললে জিজ্ঞাসা করেছে, কত্তাবাবুকে দেখলেন কত্তা ?

—একেবারে চোখের সামনে দেখলাম এই হাত দেড়েক তফাতে কথা বলতে বলতে সামনের দিকে হাত মেলে দিয়ে দেখালেন অগ্নিবাণ।

—আমি তো কই দেখতে পাইনা কত্তা—

—একি গাছের পাকা ফলটি পেয়েছিস নাকি! ঝুপ করে পাতার আড়াল থেকে মাটিতে এসে পড়বে আর দেখতে পাবি ? কতো বড় লোক ছিলেন সর্বনাম ব্রহ্ম! যখন দেহ রাখলেন তখন প্রাপ্তিযোগ স্ট্রীটের এই গলিতে কি আর দাঁড়াবার জায়গাটুকু ছিল ? শুধু লোকের মাথা আর মাথা। ব'লে কি ভাবার চেষ্টা করেন অগ্নিবাণ।

—তা কমসে কম কতো হবে কত্তা ? জিজ্ঞাসা না করে পারেনি সত্যবান।

—সে কি আর গুনে দেখেছি না মনে রেখেছি। লোকের মতো লোক ছিলেন সর্বনাম!

—তাই ভাবি, বাবার মতো বাবা একেই বলে কত্তা! সদাসত্য জ্ঞানীর মতো করে বলেছে।

—দেখ সত্য এই তোর এক দোষ। তোকে যা করতে বলি তা

করবি, যা বলিনা তাও করবি। যা ভাবতে বলি তা ভাববি, যা বলিনা তাও ভাববি।

—আজ্ঞে কত্তা সবই একটু বেশি বেশি করি। বেশি না করলে কম পড়তে পারে। যদি কাজে না লাগে তো রইল পড়ে, ক্ষতিটা কিসের। এই দেখেন না এক বাটি ছেড়ে দু বাটি ঝোল বানাই, চারটে মাছের জায়গায় ছটা। যদি খেলেন কত্তা ভালোই, আর যদি না খেলেন তো রাস্তার বেড়াল কুকুর তো সব মরে যায়নি। আর চেয়ে যদি পাতে না পান কত্তা তো আমার মুণ্ডু থাকবে! এক বাটির বদলে যদি দেড় বাটি হেঁকে বসেন, কোথা থেকে পাই—তাই সবই একটু বেশি হিসেবেই রাখি কত্তা। মাথা নিচু করে, দুহাতের তালু ঘষতে থাকে সদাসত্য।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সত্য চোখের পাতা বুঁজল অনেক রাত্তিরে। সত্য ভেবেছে কেমন করে গম্বুজ বাড়ির নম্বর চিনে এসে খোঁজ করবে বাবুর। সে দরজা খুলে দিয়ে কি রকম কায়দায় তাকে ভেতরে নিয়ে আসবে। তারপর তোয়াজ করে বসতে দেবে। কথায় কথায় কত কথাই না বেরিয়ে পড়বে। গম্বুজের দিদির নাম তো সত্যভামা, গম্বুজের কি ছোট ভাই টাই আছে? থাকলে কী নাম হতে পারে? তরমুজ? পোষা পাখি বা বেড়াল আছে? কী নাম? খরমুজ? আকাশ পাতাল সাত সতেরো ভাবতে ভাবতে সত্য শেষে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করল।

একটা মজার স্বপ্ন আসে তো আরেকটা আজগুবি, একটা দমকা হাসির তো আরেকটা চাপা হাসির। এই করে ঘুড়ির প্যাঁচকাটার মতো স্বপ্নের কাটাকুটি হতে লাগল।

ভোরে ঘুম ভাঙলে তাড়াতাড়ি বাবুকে ঠেলে তুলে দিল সত্য।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন অগ্নিবাণ। বিশেষ জরুরী কাজের দিনে লোকে সকাল থেকে উঠে তোড়জোড় করে সেই রকম কিছু একটা মনে হল অগ্নিবাণের। তাঁর মনে পড়ল আজই তো গম্বুজ চৌধুরির আসার কথা। তাই তো! নানা কথা তাঁর মনে একটি একটি করে

আসতে লাগল। গম্বুজকে সত্য ওপরে নিয়ে এলে কেমন আদর যত্ন করে বসাবেন, প্রথমে কী কথা জিজ্ঞাসা করবেন, আসতে কষ্ট হয়েছে কিনা, ঠিক চি আসতে পে কিনা, যদি
তো কিভাবে উঠে দাঁড়াবেন, এই সব ভাবতে ভাবতে অগ্নিবাণ বিছানা ছেড়ে সত্যি উঠে দাঁড়িয়েছেন।

যে বাবুকে তুলতে সাধ্যসাধনা করতে হয় পুরো একটি ঘণ্টা ধরে তাঁকে এমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখে সত্যও কম অবাক হয়নি। সে বাবুর পায়ে ডবল মোজা পরাবার কথাটাও ভুলে গিয়েছিল।

তারপর সদাসত্য আর অগ্নিবাণ দুজনে দুজনের মতলবে হাসাহাসি করতে লাগলেন। সদাসত্য বাবুকে বলে, বাবু এলে ভালো দুধ খেতে দেন এক বাটি।

অগ্নিবাণ ভৃত্যকে বললেন, দুধ আজকালকার ছেলেকে কেউ দেয়না রে সত্য। হর্‌লিক্‌স দিবি এক কাপ, চা কফির মতো খাবে তারিয়ে তারিয়ে।

সত্য বলল, বাবু, নক্‌সাকাটা গালচেখানা পেতে দেবেন বসার জন্যে।

অগ্নিবাণ বললেন, তোর কি মাথা বিগড়ে গেল নাকি? চেয়ার ছাড়া আজকালকার ছেলেদের বসতে বলা অপমান, তার ওপর গম্বুজের মতো ছেলে! ওরা কি টেবিল চেয়ার ছাড়া কথা বলে নাকি! পাঠশালায় মাদুরে বসে পড়াশুনো করেছি আমরা।

—আমারও কত্তা লেখাপড়া ওইখানে, পাঠশালে আমার হাতেখড়ি।

সদাসত্যর কথা শুনে হাসলেন অগ্নিবাণ। বললেন, কিসের হাতেখড়ি রে সত্য।

বাবুর ঘরে বড়কর্তার আমলে কেনা পুরনো দেয়াল ঘড়ি টাঙান। ঘড়িতে ঘণ্টা পড়ার শব্দ হলে টুং টুং করে জলতরঙ্গের শব্দ হবে, আর সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট্ট পুতুল ছেলে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচবে।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে পাঁচটা বেজেছে যেই অমনি কড় কড় করে

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। অগ্নিবাণ গলা খুলে বলেছেন, ওরে সত্য ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেল যে রে। আর ঠিক একই সঙ্গে সদাসত্যর গলা পাওয়া গেল, দরজায় কড়া নাড়ে কে রে ? ঘড়ির ঘণ্টা, কড়ানাড়ার শব্দ, অগ্নিবাণের হাঁক আর সদাসত্যর ডাক প্রায় একটি তালে পড়েছে।

সদাসত্যবান তাড়াতাড়ি ছুটে গেছে নিচে। অগ্নিবাণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবছেন রানী স্বর্ণস্যাকরাণী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের ছুটির পরও আরো একটি ঘণ্টা কেটেছে।

দোরগোড়ায় যাকে দেখবে আশা করে গিয়েছিল সত্যবান তাকেই দেখতে পেল। শিশুপাল—মানে আর কি গম্বুজ। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল সত্যর :

পাঁচটার ঘণ্টাটা বাজে জোরে জোরে
কড়ানাড়া শুনে উঠে ছুটে আসি দোরে
দরজায় কেন ? ঘরে এস শিশুপাল,
খাও দাও টাকা নাও থাক কিছুকাল।

সত্য যখন মনে মনে কথাগুলো আওড়াচ্ছিল সেই সময় শিশুপাল জিজ্ঞাসা করল, এটা কি শ্রীঅগ্নিবাণ ব্রহ্মের বাড়ি ? আর ঠিক সেই সময় ওপর থেকে অগ্নিবাণের গলা পাওয়া গেল, নিচে কে এসেছে সত্য ?

কার কথার উত্তর আগে দেবে একটি মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ধাঁ করে সদাসত্য বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, গম্বুজ চৌধুরি—এইটুকু বলেছে গলাছেড়ে যাতে বাবুর কানে স্পষ্ট যায়।

তারপরই শোনা গেছে অগ্নিবাণের কণ্ঠ, নিয়ে আয় ওপরে নিয়ে আয়।

—আসুন আসুন, এই সোজা গেছে সিঁড়ি—সগ্‌গের সিঁড়ি, সোজা উঠে আসুন, সিঁড়ির পথ দেখিয়ে গম্বুজকে ওপরে নিয়ে যায় সদাসত্য।

অগ্নিবাণ বহুবার বারণ করা সত্ত্বেও সত্য সগ্‌গের সিঁড়ি বলতে ছাড়ে না। বলেছে, বাবু দেশের বাড়িতে থাকি, চালাঘরে। বাঁশের

মই দিয়ে চালার মাথায় উঠে লেপ কাঁথা শুকোতে দি। সিঁড়ি তো দেখিনা বাবু, দেখলেই মনে পড়ে সগ্গের সিঁড়ির কথা।

সিঁড়ির মুখে রেডি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অগ্নিবাণ। সিঁড়ির মাথায় গম্বুজ এসে পৌঁছতেই আদর আপ্যায়ন সাদর সম্ভাষণ স্বাগতম সবকিছু জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন অগ্নিবাণ। বললেন, এস গম্বুজ এস এস, সোজা চলে এস।

—চোখ বুঁজে একেবারে সিধে চলে যান। পিছন থেকে সদাসত্য বলে।

—না বাবা তুমি খোলা চোখেই এস, ওর কথায় কান দিয়ো না। অগ্নিবাণ বললেন।

—আমি বলি কি কত্তা, চোখ খুলেই তো এলেন সারা পথ, এখন চোখের পাতা মুড়লেও তো দেখতে পাবেন বড়কত্তাকে।

সদাসত্যর কথা শুনে অগ্নিবাণ চোখ পাকিয়ে উঠেছিলেন আর কি, পরে সামলে নিয়ে বললেন গম্বুজ চৌধুরিকে, আমার বাবা লেট্ সর্বনাম ব্রহ্মের কথা বলছে সত্য, তুমি এখুনি ঠিক বুঝতে পারবে না। এস উঠে এস শিশু! হাত বাড়িয়ে গম্বুজের এক হাত ধরলেন ব্রহ্মমশাই।

ক্যানভাসার দেখেছে গম্বুজ এর আগেও। ছেঁড়া ছাতা, ছেঁড়া ক্যামবিসের জুতো, ময়লা চাদর কাপড়, আর হাতে ঝোলান ব্যাগে বই। কিন্তু ক্যানভাসারের বাড়ি যে এমন চক্চকে ঝক্ঝকে হয় তা জানা ছিল না।

ঘরের দেয়ালে টাঙানো মস্ত একখানা ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছিল গম্বুজ। তার দিকে চেয়ে অগ্নিবাণ বললেন, উনিই আমার বাবা লেট্ সর্বনাম ব্রহ্ম। আরে! বোস বোস দাঁড়িয়ে কেন?

গম্বুজ তখনও বসেনি। ঘরে নানান রকমের ছোট বড় চেয়ার। মাথায় বড় কাঁধসমান উঁচু একখানা চেয়ারে যেই বসতে গেছে অমনি সেটা সাইরেনের শব্দ করে একেবারে নিচু হয়ে মাটিতে পাতা আসনের মতো হয়ে গেল। গম্বুজ দেখল সে অগ্নিবাণের পায়ের কাছে বসে আছে।

অগ্নিবাণ তাড়াতাড়ি উঠে এসে জলচৌকির মতো একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। গম্বুজ চেয়ারখানায় বসা মাত্র সেটা একটা পাখির মতো শব্দ করে ডানায় তুলে তাকে উঁচুতে নিয়ে এল। এইবার গম্বুজ অগ্নিবাণের মুখোমুখি বসল। পা ঝুলিয়ে বসল গম্বুজ। মেঝেতে তার পা পৌঁছল না।

অগ্নিবাণ গম্বুজের সামনে চেয়ারখানা একটু এগিয়ে নিয়ে আসতেই তাঁর পিঠের পিছন দিক থেকে উঁকি মারল একটা বেঁটেখাটো আলমারি। তার ভেতরে অনেক রকমের কাপড়ে বাঁধাই অনেক রকমের বই। আলমারিটার কাঁচের পাল্লার ওপরে একটা সাদা কাগজের লেবেল আঁটা। শিশি বোতলের গায়ে এই রকম লেবেল আঁটা দেখেছে

পড়তে ইচ্ছে হল গম্বুজের কী লেখা আছে। সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে এক লাফে এসে দাঁড়াল আলমারিটার সামনে, পড়ল লেখা আছে : উঁচু যদি হতে চাও নীচু হও তবে। আর এই সঙ্গে নজরে পড়ল আরও কয়েকটা আলমারি। প্রত্যেকটার গায়ে একটা করে পট্টি মারা। ঘুরে দেখার ইচ্ছে হল গম্বুজের। সে দেখল একটার গায়ে লেখা আছে, মানুষ হইতে গেলে জানোয়ার হও। আবার আরেকটার গায়ে—বুড়ো যদি হতে চাও খোকা হও তবে। এই রকম করে আরও কয়েকটা।

তার মুখ দেখেই বুঝলেন অগ্নিবাণ, যথেষ্ট অবাক লাগছে গম্বুজের এই সব দেখে শুনে। তিনি বললেন, বস, একটু আধটু কথাবার্তা হোক আগে, তারপর তো অন্য কথা! সব বলব, আমার কথা সব বলব। শুধু কি ক্যানভাসিং! কতো রকমের কাজ আমার, কতো রকমের প্রোগ্রাম। কেন এসব লেবেল মেরে রেখেছি সব বলব তোমায়।

একটু পরেই বললেন, বল কি খাবে, দুধ না হর্‌লিক্‌স? অবিশ্যি দুধই বা কোথায় পাবে আর হর্‌লিক্‌সই বা কোথায়—তবে নাম দুটো তো আছে,—বলে হাসলেন অগ্নিবাণ।

—আজ্ঞে হর্‌লিক্‌স, ওটা তো শিশিতে আঁটা থাকে তবু, গম্বুজ বুদ্ধিমানের মতো বলে।

—তা যা বলেছ! আর দুধে ডোবার জল দিয়েছে না কলের জল তাও বোঝা মুশকিল! ব'লে সদাসত্যর দিকে এমন করে তাকিয়ে রইলেন যে ভাবখানা এই—কী, বলেছিলুম না! তারপর এল গম্বুজের জন্যে হর্‌লিক্‌স আর অগ্নিবাণের জন্যে সদাসত্যর হাতে বানানো স্পেশ্যাল টি, আফিম আর হজমি মেশানো।

হর্‌লিক্‌সের কাপ হাতে করে বসেই ছিল গম্বুজ, চুমুক দেওয়া আর হয়নি। বসে ভাবছিল গম্বুজ, সত্যিই অগ্নিবাণ ক্যানভাসার এ কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, অন্তত এখন পরমার্থপ্রাপ্তিযোগ স্ট্রীটের এই ঘরে বসে।

কোন ক্যান্‌ভাসারের বাবা দেয়ালজোড়া ছবিতে এমন করে বসে থাকতে পারেন? ক্যান্‌ভাসার কি আর দেখেনি এর আগে?

—কী ভাবছ? হর্‌লিক্‌স যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল! অগ্নিবাণের গলা শুনে গম্বুজ সর্বনাম ব্রহ্মের ছবির ওপর থেকে চোখ তুলল।

একটি চুমুকে যে ভাবে সাবাড় করল হর্‌লিক্‌সের কাপ তাইতে না হেসে পারলেন না অগ্নিবাণ, তাঁর মনে হল জুড়িয়ে ঠাণ্ডা করার অপেক্ষায় ছিল বুঝি।

—লেখাপড়া ছাড়া আর কী কী তোমার ভাল লাগে? আদুরে আদুরে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন অগ্নিবাণ।

—দেখুন লেখাপড়াটা ছাড়া আর আমার সব কিছুই ভাল লাগে। গম্বুজ মনের কথাটা তবু একজনকেও বলতে পেরেছে এই রকম খুশি-খুশি ভাবে বলে ফেলল।

—বুঝতে পারছি, খুউব বুঝতে পারছি। তোমার মত বয়সে আমার মুখে এমন কথাই ছিল। এ্যাক্‌টিং ছাড়া আর কিছু জানতাম না। বাবাও ছাড়বার পাত্তর ছিলেন না। অবিশ্যি শেষকালে এ্যাক্‌টরই হলাম। শা-জাহানের পার্টে এমন নাম করেছিলাম যে নামই হয়েছিল শা-জাহান ব্রহ্ম। কোন ভয় নেই। লেখাপড়ার

চিন্তাটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। আগে বল ওইটে ছাড়া আর কী সব তোমার ইন্‌টর্‌এস্‌টিং লাগে, মানে তুমি ভালবাস?

—আজ্ঞে তার আগে একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করব। গম্বুজের অনুরোধে অগ্নিবাণ কেমন কিন্তু-কিন্তু বোধ করলেন।

—আরে একশোবার করবে। অগ্নিবাণ তড়িঘড়ি বলে ওঠেন।

—আজ্ঞে ক্যান্‌ভাসারের পার্ট কি আপনি কখনও করেননি?

—হেঁ হেঁ, ধরেছ ঠিকই। তুমি ইন্‌টেলিজেন্‌ট ছোকরা, ধরবে না-ই বা কেন? এককালে যে এ্যাক্‌টিং করতাম তারই জোরে। এই প্রথম ক্যান্‌ভাসারের পার্ট করলাম, রিহার্স্যাল দেওয়ার আর দরকার হল না, একেবারে স্টেজ-সাক্‌সেস। তুমি কি বল?

—আমি তো বুঝতেই পারিনি—মানে—

—মানে কি আর বলতে হবে না, আমি খুব বুঝতে পেরেছি। ভেবেছ আমি ক্যান্‌ভাসিং ছাড়া আর কিছু করতে পারি না। তা ঠিকই ভেবেছ। এই দেখনা যেমন তোমার জন্যে এখন ক্যান্‌ভাসিং করছি। টাকাটা তো অনেকেই হাতাতে চায়, কিন্তু তোমার হাতেই যাবে।

—কী বললেন? টাকা?

—হ্যাঁ টাকা। আমারই টাকা, আমিই ক্যানভাসিং করছি। আর করছি তোমারই জন্যে, বুঝলে কিছু? অগ্নিবাণ কথা শেষ করে গম্বুজের পিঠ চাপড়ে দেন।

—আজ্ঞে কিছুই তো বুঝলাম না। গম্বুজের গলার স্বর স্পষ্ট মনে হল না অগ্নিবাণের।

—আরে সব বুঝতে পারবে, বোঝাবার জন্যেই তো এত কাণ্ড!

কী যে বোঝাবেন অগ্নিবাণ আর কী বা এত বোঝানোর আছে ভেবে গম্বুজ না পায় কূল, না পায় কিনারা। তবে টাকার কথা বলছেন যখন তখন কাণ্ড কারখানা কিছু থাকা একটা অসম্ভব নয়। গম্বুজ আসলে চেয়েছে অগ্নিবাণ তাঁর বইয়ের থলি থেকে এমন কিছু বার করে দেবেন যা মুশকিল আসানের মতো। আর পারেনা গম্বুজ এতগুলো

বিষয়ের ঝামেলা সামলাতে। অঙ্কর ভূত ভয় দেখায় তো সংস্কৃতর সং তার ওপর দিনরাত রেগে টং হয়ে আছে। ইতিহাসের বই খুললে মনে পড়ে কোন কোন বড় যোদ্ধা পাতিহাঁসের মাংস খেতে ভালবাসতেন, ভূগোলের কথায় গণ্ডগোলটা যে কবে শেষ হবে বোঝা যায় না। কারণ হিন্দুস্থান পাকিস্তান ফাঁকিস্থান ছাড়াও ভূমণ্ডলের বাইরে বাকিস্থান আর কি কি পড়ে আছে এখনও ঠিক জানা যাচ্ছে না। যে সব জায়গা গুলো বাকি পড়ে আছে সে গুলোকে তো জিয়োগ্র্যাফির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এটাও তো কম ভাবনা চিন্তার ব্যাপার নয়!

গম্বুজকে গম্ভীর হয়ে ভাবতে দেখে ব্রহ্মমশাই আবার খুশির গলায় জিজ্ঞাসা করেন,—অত ভাবনা চিন্তার কিছু নেই তো তোমাকে বললাম। বিজ্ঞানের পতাকা উড়ছে আকাশে মাটিতে জলে মহাশূন্যে, মায় চোখে দেখা যায় না যে সব এলাকা সে সব জায়গাতেও। চোখ বুঁজে মানুষ যা চাইছে তা-ই তার হাতের মুঠোয়। এ হচ্ছে বিজ্ঞানের যাদু। সব জিনিসকে নস্যির ডিবেতে পুরে রাখতে পার। হাজার হাজার মাইল দূরে যে সব জায়গা সেগুলো মোড়ের দোকান বা বাজার হাটের চেয়েও কাছে এসে গেছে। আর তুমি তিন চারশো পাতার বই তিরিশ চল্লিশ পাতায় ছেঁটে দিতে পারবে না? বল কি হে মাস্টার! আর তা ছাড়া সরকারী পরিকল্পনার কি রকম তোড-জোড় চলছে তা নিজের কানেই তো শুনছ, চোখে দেখছ। এই তো দু'চার দিন আগেই সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। বড় বড় মোটা মোটা বইগুলোর অদরকারী পাতা ছাঁটাই—এসবও আছে সরকারী নতুন প্ল্যানে। সংবাদ ভাণ্ডার তুমি পড়না বুঝি?

—আজ্ঞে কী বললেন? গম্বুজ জিজ্ঞাসা করল।

—সংবাদ ভাণ্ডার, মানে আর কি নিউজ পেপার। ওই তো একখানাই কাগজ! সব রকমের নিউজ পাবে। অদরকারী খবরও যে কত দরকারী তাও জানতে পারবে। দেখ না, বিজ্ঞাপনে লেখে না—নিয়মিত সংবাদ ভাণ্ডার পড়ুন।

যতোই অগ্নিবাণের কথা শোনে গম্বুজ অবাক হয়, মুগ্ধ হয় সে।

সে মনে মনে ভাবল, আহা! ক্যান্‌ভাসার না-হয়ে কেন তিনি তাদের স্কুলের হেড্‌মাস্টার হলেন না।

—হ্যাঁ যে-কথাটা তোমায় আগে জিজ্ঞাসা করব মনে করছিলাম। তোমার নামটা আমার কাছে, কী যে বলি—চমৎকার বললে কিছুই বলা হয় না—মানে, আচ্ছা সব কিছু থাকতে গম্বুজ কেন? ধর, মন্দির হতে পারত, মসজিদ হতে পারত, গির্জে—তাও হতে পারত! জানতে খুব ইচ্ছুক এই ভাবে অগ্নিবাণ তাকিয়ে রইলেন।

—আজ্ঞে নামের সত্যি একটা মানে আছে। লাজুক লাজুক শোনায় গম্বুজের গলা।

—আরে সেইটাই তো আগে শুনতে চাই! গম্বুজের কথা শোনবার জন্য অগ্নিবাণের গলা বুঁজে আসে।

—আজ্ঞে আমি জন্মেছিলাম একটা গম্বুজের মধ্যে, সেই জন্যেই নামটা—গম্বুজ এইটুকু বলে থামল।

—মানে গম্বুজের মতো বাড়িটার চেহারা বলছ? অগ্নিবাণ পরিষ্কার করে নিতে চান কথাটা।

—আজ্ঞে না, একেবারে গম্বুজ, যাকে বলে আর কি টাওয়ার। গম্বুজ চৌধুরি জোর দিয়ে বলে।

—তা গম্বুজ কেন?

—আজ্ঞে আমরা আগে যেখানে থাকতাম সেখানে কেবলই গম্বুজ, মানে গম্বুজের সংখ্যাই বেশি। বাবা বাড়ি না নিয়ে গম্বুজ ভাড়া নিয়েছিলেন।

—নাম কী জায়গাটার?

—আজ্ঞে এখনও যে-সব জায়গা ভূগোলের বাউন্‌ডারিতে আসেনি তারই মধ্যে পড়ে। হিন্দুস্থান পাকিস্তান যে রকম, সেই রকম বাকিস্থান। তবে এখন লোকে গম্বুজস্থান নামই দিয়েছে।

—তা হলে গম্বুজ, তুমি গম্বুজস্থান থেকেই আসছ।

—আজ্ঞে, সে কথা তো ঠিকই।

—ওখানে তোমার পড়াশুনো?

—পড়াশুনো কিছু করতে হত না। শিশুদের পালের গোদা ছিলুম আমি। আর শিশুপাল নামও হয়েছিল ওই জন্যে।

—তা তো বটেই!

—আমরা দল বেঁধে রাস্তা খুঁজতে বেরতাম। আসলে হিন্দুস্থান না পাকিস্তানের দিকে গেছে গম্বুজস্থানের কাঁচাপাকা রাস্তা এটা জানা দরকার ছিল আগে।

—বল বল, শুনতে বেশ লাগছে। গম্বুজ থামতেই উৎসাহ দিয়ে বললেন অগ্নিবাণ।

—একদিন একদল হিন্দুস্থানী পুলিশ আমাদের দলটাকে ধরে খুব জোর ধমক দিয়ে দিল। বলল, পাকিস্তানে কিংবা চীনে যাওয়ার চেষ্টা করছ তোমরা। তোমরা বিদ্রোহী শিশু। শিশুর দল তো ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। আমি শুধু সাহস করে বললাম, আমরা এসব কিছুই চাই না। আমরা দেখতে চাই ভূগোলের মধ্যে জায়গাটা আছে কিনা, আর থাকলে ম্যাপের কোথায় বসবে। আমরা অভিযাত্রী। শেষকালে গম্বুজ নাম নিয়ে চলে এসেছি এখানে।

—বেশ করেছ বাবা, ভালো করেছ। এখানেও তোমার কাজ হবে বিদ্রোহ করা। বুড়োদের বিরুদ্ধে হবে তোমার বিদ্রোহ। এ সব কথাও পরে হবে। আরও দু চারটে কথা হওয়া দরকার আগে।

অগ্নিবাণ যখন থামলেন গম্বুজের আবার মনে হল হেড্‌মাস্‌টারের মতোই কথা বলছেন বটে ব্রহ্মমশাই।

—দেখ গম্বুজ, আমি নিজে বুড়ো হলেও, বুড়ো বয়েসটার জন্য আমার দুঃখ হয়। সেই জন্যে বুড়ো দেখলেই আমি মনে মনে ক্ষেপে উঠি। কোন বুড়ো যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তো মনে হয় তোমাদের মতো ছেলে ছোকরা সাদা দাড়ি চুল পরে আমাকে ঠাট্টা করছে। যখন বুড়ো শা-জাহানের পার্ট করেছি তখন তো ইয়ং ম্যান! বুড়ো হওয়া যে এই রকম ব্যাপার তখন কি আর জানতাম। জানলে বুড়ো শা-জাহানের পার্ট অন্তত করতাম না। আচ্ছা গম্বজ, বয়সটা কি

কিছুতেই কমান যায় না ? এই ধরনা কেন, আমায় যদি কেউ বলে, এই তো মোটে চল্লিশ পেরলেন !

অগ্নিবাণের কথায় গম্বুজ দু চার মিনিট মুখ বুঁজে রইল। তারপর টিম টিম করে হাসল। শেষকালে বলল, আজ্ঞে এসব কথাও আমাদের ভাবা হয়ে গেছে।

—কী ভাবা হয়ে গেছে গম্বুজ ? সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন অগ্নিবাণ।

—আজ্ঞে ভূগোলের মধ্যে যে সব জায়গার নাম নেই এখনও পর্যন্ত সেই রকম একটা জায়গার খোঁজ খবর চালাচ্ছিলাম। সেখানে নাকি আপনার চব্বিশ মাসে এক বছর।

—তাই নাকি তাই নাকি ? তারপর—

—আজ্ঞে ওই রকম কোন একটা জায়গা যদি ম্যাপের মধ্যে চলে আসে তা হলে আপনি পরমার্থপ্রাপ্তিযোগ স্ট্রাটের বাড়িতে আর কেন থাকবেন ?

—গুড্ আইডিয়া ! ঠিক বলেছ গম্বুজ। একটু কষ্ট হবে বটে, বাবা লেট্ সর্বনাম ব্রহ্মের এই বাড়ি ছেড়ে—যাক ও কথা, বল কি বলছিলে—

—ওখানে থাকলে চুল দাড়ি গোঁফ পেকে গেলেও চট করে বয়েস ষাট হবে না। চল্লিশ কেন, ওখানকার হিসেবে আপনার বয়েস তিরিশের বেশি নয়।

—সত্যি গম্বুজ তোমার মুখের কথা শুনেও আশা হয় এখনও। ব্যাপারটা চুকে গেলে তোমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করা যাবে। ভাবলেও মনটা চাংগা হয়ে ওঠে। এখন এই বয়সে যদি কারও মুখ থেকে শুনি এই সবে তিরিশ পেরিয়েছি !

আসলে ব্যাপারটা যে কী এখনও ঠিক মাথায় ঢুকছে না গম্বুজের।

প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন, হঠাৎ মনে পড়েছে এই ভাবে বললেন অগ্নিবাণ, ভাল কথা, খবরটা তুমি আমায় খুলে বেশ ফলাও করে লিখে দিতে পার গম্বজ, বেশ জোরাল ভাষায় ?

—আজ্ঞে তা দিয়ে হবে কি? গম্বুজ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—কী হবে বলছ? সংবাদ ভাণ্ডারে ছাপিয়ে দেব। ওরা তো এইসব নিউজই চায়। আর ওই রকম একখানা নিউজ পেপারে এই রকম একটা খবর ছাড়লে ব্যাপারখানা কি হবে একবার বুঝতে পেরেছ? সরকারের টনক নড়বে, বুঝতে পারছ?

—তা হলে আরও একটু ভালো করে খোঁজ খবর চালিয়ে নিই?

—আরে আর ভালোর দরকার নেই। তুমি এই খবরটাই ভাল করে গুছিয়ে লিখে দাও না, তারপর যা ভালো করবার ওরা নিজেরাই করে দেবে।

—যে আজ্ঞে! গম্বুজ যখন বলল তাকে কেমন ভীতু-ভীতু দেখাল।

অগ্নিবাণ চুপ করে কি একটা ভেবে নিচ্ছিলেন, সদাসত্য সেই ফাঁকে গম্বুজকে বলল,—আরে এ সব খবরই তো চায় মানুষে। চাল ডাল তেল নুনের খবরে সব ভিরমি খায় আজকাল। বাবু কাগজ বার করলে কিলো কিলো এই সব খবর জোগাড় করে আনব।

সত্যর কথা কান যেতে হাসলেন অগ্নিবাণ। বললেন, সত্যর আইডিয়াটা মন্দ মনে হচ্ছে না মাঝে মাঝে। এখন তোমায় দেখে ভাবছি, এডিটর করে দেব, মানে আর কি সম্পাদক। আচ্ছা, তার আগে একটা কথা। তোমার শখ কি? মানে, কী তোমার ভাল লাগে? কী তুমি করতে চাও?

কথাটা শুনে গম্বুজ কেমন একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব দেখাল।

—আরে লজ্জা কিসের! আমি তো জানতে চাই। জানা আমার বিশেষ দরকার, অগ্নিবাণ উৎসাহ দিয়ে বলেন।

—আমার নানা ধরনের আবিষ্কার আছে, বলতে বলতে গম্বুজ চৌধুরি কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ করল।

—থামলে কেন? বল বল, কি রকমের আবিষ্কার সব শোনাও একটু আধটু।

—আজ্ঞে যেমন ধরুন মশা তাড়াবার জন্যে মশারী। আমার আবিষ্কারটা হল মশা ধরবার জন্যে মশারী, বুঝতে পারলেন ?

—একটু খুলেই না হয় বললে বাপু।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আর কি ঘরের যতো মশা সব মশারীর মধ্যে আটকে রাখা। তারপর মশা গুলো সব মশারীর মধ্যে ঢুকলে আপনি রইলেন মশারীর বাইরে। মশার ভয়ে মশারীর মধ্যে ঢোকার মানে তো মশার কাছে সারেন্ডার করা। আর এই রকমের মশারীর প্ল্যানও আমার মাথায় আছে। যারা বানাবে তাদের সঙ্গে আধাআধি বন্দোবস্ত।

—একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়না তোমার থিয়োরি। মশার কাছে সারেন্ড়ার ! মশারীর মধ্যে ঢোকা মানেই তো মশাকে ভয়ে খাতির করা !

—আজ্ঞে ঠিক তাই, গম্বুজ গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল।

—আচ্ছা, এ ছাড়া আর কিছু ? অগ্নিবাণ আবার প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে বাটারফ্লাই নামটা অঙ্ক আর রসায়নের সাহায্যে প্রমাণ করা।

—তারমানে প্রজাপতি নামটা পেতে গেলে ম্যাথামেটিক্স আর কেমিস্ট্রি জানতে হবে। বেড়ে বলেছ, বল বল, আমার চৌবাচ্চার জলের জন্যেও কেমিস্ট্রির একটা ফরমূলা আছে।

—যেমন ধরুন বাটারফ্লাই-এর সঙ্গে আপনি ফ্লাই জাতের ফায়ার ফ্লাই নেবেন। পাশাপাশি রাখুন বাটারফ্লাই আর ফায়ারফ্লাই। দুটোতেই ফ্লাই আছে, সরিয়ে রাখুন। পড়ে রইল বাটার আর ফায়ার। আর বাটার যদি ফায়ারে এসে পড়ে তো আর বাটার থাকে না, গলে এক্কেবারে ফ্লাই করে। এই ভাবে বাটারফ্লাই।

—না, বুদ্ধি তোমার আছে গম্বুজ। মাথা এদিকে বেশি খেলে বলেই হয় তো ক্লাসের পড়া ঠিকমত ম্যানেজ করতে পারছ না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি যখন আছি সব ব্যবস্থা হবে। তা ছাড়া বুদ্ধি যার তারই জয়। তোমার এই সব আইডিয়ার কথা যখন যেমন মাথায় আসবে আমায় জানাবে। দেখি যদি কাগজ বার করতে

পারি তো কাজে লাগবে এসব। কেবল রাজনীতির খবরে চলে না আজকাল। এ সব খবর খুবই দরকার, নইলে কাগজের সেল বাড়ে না। সংবাদ ভাণ্ডারের বিক্রি কত জান এখন ? ভাবতে পারবে না।

—এই তো আমাদের পাপ্‌তি যোগ ইস্ট্রীটেই চার কুড়ি দশ কি পাঁচ কুড়ি খদ্দের আছে! সদাসত্য সব কথা হাঁ করে শোনবার পর বলল।

—হিসেব তোর হাতে হাতে সত্য! অগ্নিবাণ সদাসত্যকে কথাগুলো বলে গম্বুজের দিকে চেয়ে হাসলেন।

পরে সদাসত্যবানকে বললেন, ডবলহাফ বিনাপানি স্পেশ্যাল টি একটু খাওয়াবি নাকি সত্য ?

সদাসত্য বাবুর আবদারের পর আর একটুও অপেক্ষা করতে পারল না।

সত্যবান বাইরে গেলে চাপা গলায় অগ্নিবাণ শুরু করলেন, সত্য আমার বুকের পাঁজরার মতো, তবু তোমায় একটা কথা বলে রাখা ভাল তোমার দায়িত্ব কিন্তু আর কাউকে দিলে চলবে না। মানে তুমি এখন থেকে আমার লাইফ। তুমি একটু এদিকে ওদিক হলেই ব্যাস্! আমি চোখে অন্ধকার দেখব।

ব্যাপারটা যে কি এখনও গম্বুজ ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি। শুধু একটু একটু বুঝতে পারে টাকা কড়ির কোন ব্যাপার আছে একটা।

—তোমাকে একটু আগেই বলছিলাম না কিছু টাকা, বেশি নয় লাখ দেড় দুই, হাতাতে চায় কিছু লোকে আমার হাত থেকে। আমার ইচ্ছেটা উল্‌টো। টাকাটা তোমার হাতেই দেব। বেশ ভেবে চিন্তেই ঠিক করেছি তোমার হাতেই দেব। এই ধরনা কেন, রিটায়ারড্ হেডমাস্‌টার, সাব্-জাজ্, উকিল, ব্যারিস্‌টার, ডাক্তার, অফিসের বড়বাবু, জন কয় এম. এল. এ. আর বিজ্‌নেস্ ম্যান—সব্‌বাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে পোস্‌টটার দিকে।

ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এই টাকাটা দিয়ে একটা ওয়েলফেয়ার অরগানইজেসনের মতো করতে চাই, অর্থাৎ কিনা জনকল্যাণ সমিতি।

সেই সমিতির একজন প্রেসিডেন্ট চাই। আর এই প্রেসিডেন্টের হাতেই যাবে টাকাটা। যাদের কথা বললাম তারা সবাই চায় প্রেসিডেন্ট হতে। আমার ইচ্ছে তুমিই প্রেসিডেন্ট হও। তোমার বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি খাটাও আর বুদ্ধি খাটিয়ে টাকাটাও কাজে লাগাও।

অগ্নিবাণ ব্রহ্ম যখন থামলেন গম্বুজ চৌধুরির মাথা তখন গম্বুজেই চড়েছে বটে! বলেন কি ব্রহ্মমশাই! এই কথা বলবার জন্যেই তবে তাকে এইখানে নিয়ে আসা! সে ছেলে আটক করার গল্প শুনেছে, একি কিড্ন্যাপ্ করার মতলব? না হলে দেড় দুলাখ টাকার লোভ তাকে কেউ দেখায়!

গম্বুজ ভয়ে ভয়ে অগ্নিবাণের দিকে তাকালে অগ্নিবাণ হেসে ফেললেন। তিনি গম্বুজের মুখ দেখে বুঝতে পারেন, সে ভয় পেয়েছে, ঘাবড়িয়ে গেছে। পরে তাকে স্বপ্নের কথা সব বললেন। তাকে সাহস দিয়ে আরও বললেন, এই জন্যেই তুমি ছাড়া আর কেউ প্রেসিডেন্ট হতে পারে না, বুঝলে গম্বুজ?

ভয়ে ভয়ে আমতা আমতা করে গম্বুজ বলে ফেলল, আর কেউ প্রেসিডেন্ট হতে পারে না? কিন্তু আমি তো পরীক্ষায় ফেল হয়ে যাই।

—আরে পরীক্ষায় ফেল হলে তো হয়েছে কি! প্রেসিডেন্টের পরীক্ষায় তো আর ফেল হওনি, অগ্নিবাণ গলা ছেড়ে বলে উঠলেন। গম্বুজ আরও কি বলতে যাচ্ছিল। অগ্নিবাণ থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি দ্বিতীয় আর কোন কথা শুনতে চাইনা। তুমি আমার অফার অ্যাক্সেপ্ট করেছ কিনা, মানে প্রেসিডেন্ট হতে রাজী হয়েছে কিনা জানাবে। চিঠি লিখে জানাবে। তুমি অনিচ্ছায় মত দিচ্ছ না আর আমিও জোর করে তোমায় রাজী করাচ্ছি না। যাকে বলে রিট্ন্ এগ্রিমেন্ট। তুমি লিখে আমার হাতেও দিয়ে দিতে পার, সদাসত্য রইল সাক্ষী; আর চিন্তা করে দেখার যদি সময় চাও তাও পেতে পার। তবে সেটা সময় নষ্ট করা। যা ভাবার তোমার আসলে ভাবা হয়ে গেছে, কি বল?

—দেখুন ভেবে আমি চটপট ফেলতে পারি . তবে কিনা এতগুলো টাকা। একবার বাজার খরচ পকেট থেকে চুরি যাওয়ায় চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ি ঢুকিনি। চব্বিশ ঘণ্টা খাইনি। বাড়ি ফেরার পর আরও বার ঘণ্টা উপোস। তাই ভাবছি···গম্বুজ কি চিন্তা করে থামতে চাইল।

—আরে আমি বুঝতে পেরেছি ভাবনা কিসে। তা টাকা তোমার নিজের কাছে রাখতে হবে না। পাহারা দেবার জন্যে থাকবে সত্য। তুমি শুধু মাথা খাটিয়ে প্ল্যান বার করবে। আর ছিপ খেলানোর মত টাকা খাটাবে। তুমি শুধু মন ঠিক করে ফেল চটপট।

—আজ্ঞে মন আমার ঠিক করতে যে সময় লাগে তাতে একবারও হেঁচকি তোলা যায় না। আমার বোন সত্যভামা একদিন রেগেমেগে আমাদের গোটা মহাভারতখানা ছিঁড়তে গেল। বাবা দুজনেরই নাম লিখে দিয়েছিল। চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, খবরদার! বইতে আগে লেখা আছে শিশুপাল, তারপর সত্যভামা। তুই কর্ণপর্বের পর থেকে ছিঁড়তে পারিস ইচ্ছে হলে। কর্ণের মৃত্যুর পর আমি আর মহাভারত পড়িনা। খুব ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল সত্যভামা; আস্ত মহাভারত খানা আমার হাতে ফেরত দিয়ে দিল। আমি বললাম, কর্ণের মত বীর মারা গেলেও যারা মহাভারত পড়ে যায় তারা তোর মতন ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে। যা ভাগ্ সামনে থেকে—এমন মুখ করে বলল গম্বুজ যে অগ্নিবাণ ব্রহ্ম হেসে ফেললেন। গম্বুজের পিঠে অল্প চাপ দিয়ে তিনি বললেন, তা হলে এক নম্বর কাজ তো হয়েই গেল। তুমি তোমার কাজের ছেলেদের সব নাম ধাম ঠিক ঠিকানার লিস্ট তৈরি করে ফেল। কতো টাকা নিয়ে কাজে নামতে হবে তারও মোটামুটি একটা হিসেব সবাই মিলে ছকে ফেল। তবে দেখ বাপু আমার ওই ফারসট ফাইভ ইয়ার, সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার—এত সব দেরি পোষায় না—তুমি অন্‌লি ফাইভ প্ল্যান্‌সের মধ্যে সেরে দাও। নাম কি হবে বল তো?

—আজ্ঞে অগ্নিবাণ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি, গম্বুজ মাথা নিচু করে বলল।

দুই

অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নিজস্ব আফস থাকা দরকার, গম্বুজ প্রথম দরকারা কথাটা অগ্নিবাণের কানে তুলল।

অগ্নিবাণ বললেন, এটা তো কোন সমস্যাই নয়। আমার পরমার্থ প্রাপ্তিযোগ স্ট্রীটের সবচেয়ে ভাল আর সবচেয়ে গোপন ঘরখানা তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। ঘরে ডবল দরজা ডবল জানলা। আর ঘরখানার ইচ্ছে মত সাইজ্ চেন্জ করা যায়। যেমন ধর দরকারের সময় দলের সবাইকে কাজে পাঠিয়ে তুমি চারকোণা ঘরকে তেকোণা করে, মানে একটা দেয়াল ছাঁটাই করে, তুমি যত পার ঘুমিয়ে নাক-ডাকিয়ে কিংবা জেগে চোখ-তাকিয়ে চিৎপটাং হয়ে আকাশপাতাল জরুরী চিন্তা কর। ভাল কথা, তোমার দলের লোক ঠিক হয়েছে মানে ছেলে জোগাড় করেছ? বাছাই ছেলে?

খুবই দরকারী প্রশ্ন বটে। অর্থাৎ অগ্নিবাণ বলতে চান, নিজস্ব অফিসে যে-সব নিজস্ব কর্মী কাজ করবে তাদের নামের প্রাইভেট লিস্ট তৈরি হয়েছে?

গম্বুজের হাতে নামের তৈরি লিস্ট ছিল না, তবে একেবারে অকেজোর মত বসেও ছিল না সে। বলল, আজ্ঞে মোটামুটি বাছাই করা আছে শুধু ফাইনাল করে ফেলা। কাকে কী নাম দেওয়া হবে সেটা ঠিক করা, মানে কে কোন নামের যোগ্য। আমি এই দু' এক দিনের মধ্যে আপনাকে লিস্ট দিয়ে দেব। বাছাই ছেলেদের নিয়ে হবে কমিটি আর এর বাইরেও থাকবে কাজের ছেলে, নানা রকম ফিল্ড ওয়ার্কের জন্যে। ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির অফিসে এদের সবাইকে ডেকে আজকালের মধ্যেই একটা সভা, মানে মিটিং কল করব।

অগ্নিবাণ শুনে খুশি হলেন বুঝি। বললেন, ভাল কথা, তোমাদের অফিসের দরকারী ফাইল কাগজ পত্তর সব সদাসত্যর হাতে থাকবে। বাংলায় লেখা নোটিশ চিঠিপত্তর ও পড়তে পারে। আর ওরই হাতে

ঘরের চাবি। তোমরা দরকারী মিটিং কল করলে ও থাকবে দরজায় পাহারায়। সত্য এ দরজায় সংকেত দিলে তোমরা ও দরজা দিয়ে ওয়ান্ বাই ওয়ান্, আর সদা যদি এ জানলায় উঁকি মারে তো ও জানলা দিয়ে টু বাই টু ; বুঝতে পারলে ?

—আজ্ঞে টু বাই টু জানলা দিয়ে ? গম্বুজ জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ ঠিকই তো ! দরজা দিয়ে ওয়ান্ বাই ওয়ান্ বেরিয়ে যাবে, আর জানলা দিয়ে টু বাই টু লাফিয়ে পড়বে।

— নিচে ? একটু ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করে গম্বুজ ! শুনে হো—হো করে হেসে ওঠেন অগ্নিবাণ। বলেন, লাফিয়ে নিচে পড়বে না তো ওপরে উঠবে ? এখন কথা হল কোথায় পড়বে, এই তো ? সে ভাবতে হবে না ভালো জায়গাতে গিয়েই পড়বে। আমার বাড়ির চৌবাচ্চায়, যে চৌবাচ্চার জলে মরা মাছ জ্যান্ত হয়ে আবার পুকুরে চলে যায়। তোমরাও পড়বে ঝপাঝপ আর রাবারের বলের মত লাফিয়ে ভেসে উঠবে, বুঝতে পারলে ? কথার শেষে আবার গলার জোরে হেসে ওঠেন অগ্নিবাণ।

অগ্নিবাণের সঙ্গে যতই মেলামেশা করে গম্বুজ, যত বেশি আলাপ হয়, ততই অবাক হয়। কথাবার্তা শুনে তার নিজেকে কত বোকা মনে হয়। সে মনে মনে ভাবে হেড্‌মাস্‌টার হতে গেলে কিংবা মিনিস্‌টার হতে গেলে অগ্নিবাণের মত লোকের দরকার।

সদাসত্যবান এই সময় পা-টিপে-টিপে ঘরে ঢুকল। এমন নিঃশব্দে যেন চোরের মতন। যখন তার বাবু কারও সঙ্গে দরকারী কথাবার্তা বলেন, ছোটই হোক আর বড়ই হোক, গোলযোগ যাতে না-হয় তারই জন্যে সে এমন নিঃসাড়ে আসে। এ তাকে শেখাতে হয়নি কাউকে।

—আজ্ঞে বাবু ঘরদোর সাফসুফ করে এলুম, বলেন তো ঘরে তালা ঝুলিয়ে দি। এই বলে সত্য ট্যাঁক থেকে সিকির মত ছোট্ট একটা তালা বার করে দেখালে, চোখে দেখাই যায় না এত ছোট্ট ! পরে কানের ফাঁক থেকে বার করল আলপিনের মত চাবি।

গম্বুজ একটু অবাক হয়ে গেল বই কি ! এত বড় বড় দরজায়

অতটুকুন তালা ! তাকে অবাক হতে দেখে অগ্নিবাণ বললেন, দেখনা, দেখ, মজার জিনিসই বটে। গড্‌রেজের তালার নকল চাবিকাঠি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এই তালার নয়। সত্যর সব কিছুর মত এও এস্‌পেশাল্‌।

অগ্নিবাণ গম্বুজের দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, এ তালার ইতিহাস আছে। একবার এক ছিঁচকে চোর, কত আর বয়স হবে, এই তোমাদেরই বয়সী, চুরি করতে এসে ধরা পড়েছিল। বেচারার দোষ নেই, সবে ট্রেনিং নিচ্ছিল। সে-কথা ধরা পড়ার পর সে স্বীকারও করেছিল। তার আগে পর পর দু দিন বেচারা ফাঁকে পড়েছিল। এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে একটা ব্যাগ চুরি করেছিল। তার মধ্যে ছিল একখানা দাঁতভাঙা চিরুনি আর দুটো হোমিওপ্যাথি ওষুধের মোড়ক। আর এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে তুলেছিল আরেকটা পুরনো ব্যাগ। তার মধ্যে ছিল কাগজ থেকে কাটা কর্মখালির অন্তত শ' খানেক বিজ্ঞাপন। সে সর্দারকে গিয়ে বলে, দূর ছাই ! এ দেশে লোকে চুরি করে ! কারও পকেটে একটা কানাকড়ি নেই। সর্দার তখন বলল বাড়িতে ট্রাই নিতে। আর শেষকালে ট্রাই নিতে গিয়ে প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি। ভেবেছে পরমার্থপ্রাপ্তিযোগ স্ট্রীটে অনেক অর্থপ্রাপ্তি হবে। ধরা পড়ার পর সত্য ওকে সার্চ করে ওই তালা আর চাবি পায়। সদাসত্য আর কিছু না-পেয়ে তালাচাবি নিয়েই ওকে ভয় দেখায়, বল শিগ্‌গির কোথায় পেলি, না হলে আজই পুলিশে দেব। শেষে কথায় কথায় সব বেরিয়ে গেল। সর্দার ছেলেবেলায় এই তালাচাবি পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর কাছ থেকে। গুরু বলেছিলেন চুরিকরা টাকা পয়সা যদি এই তালাচাবি দিয়ে বন্ধ রাখিস তো কখনও খোয়া যাবে না। তেত্রিশকোটি দেবদেবতার নাম স্মরণ করে বন্ধ করার সময় বলতে হবে, তালা তালা তালা এবার বন্ধ হওয়ার পালা। আবার খোলার সময় সেই একই রকম ; শেষে বলতে হবে তালা তালা তালা এবার খোলার পালা। লোকসংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যেমন অগুনতি হয়েছে, সেইরকম

দেবদেবতার সংখ্যাও যদি চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ কোটি হয় তো তাঁদেরও সেই মত স্মরণ করতে হবে।

সদাসত্যর হাত থেকে তালাচাবি চেয়ে নিয়ে গম্বুজ পরীক্ষা করার মত দেখতে লাগল। সত্য বলল, দেখার আগে মাথায় ঠেকাতে হয়! তোমরা আজকালকার ছেলে, কিছুতে বিশ্বাস করবে না তো আর!

গম্বুজ তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজে তালাচাবি মাথায় ঠেকাল।

রাত্তিরে গম্বুজ শুয়ে শুয়ে ভাবছিল: সে শুয়ে আছে অগ্নিবাণ ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটির অফিস ঘরে। সে শুয়ে আছে আর কোন দরকারী কথাটা আগে ভাববে এই চিন্তায় রীতিমত মাথা ধরে গেছে।

ভাবতে ভাবতে মনে হল ঘরখানা ত্রিভুজের মত তেকোণা হয়ে যাচ্ছে। জ্যামিতির কখগ একটি ত্রিভুজ। আর এই থেকে সে মনে মনে তৈরি করতে পারল, ক-য়ে কর্ণধার ওগো কর্ণধার, কর্ণধার কে? সেই কর্ণধার তো অগ্নিবাণ ব্রহ্ম! খ-য়ে খবরদার, কে সেই খবরদার, না সদাসত্যবান। আর গ-য়ে গুপ্তদ্বার। গুপ্তদ্বার তো সে নিজেই—গম্বুজ চৌধুরি! তার মধ্যে দিয়ে একজন একজন করে দলের চারজন বুড়োদের এলাকা ফেলে ছেলেদের এলাকায় পালিয়ে বাঁচছে। দলে তাকে ছাড়া আরও চারজনকে দরকার, চারজন রীতিমত কাজের ছেলে। কারা এই চারজন....কারা, ভাবতে ভাবতে উঠে বসল গম্বুজ। ঝাঁকে ঝাঁকে নাম মুখে চোখে বিষ্টির ছাটের মত এসে লাগছে। আর সেই নাম থেকে তিনটে মাত্র নাম মনের মত হওয়ায় মাথার মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল। অনেক নামের মধ্যে মাত্র তিনটি. দারা সিং, নরাধম আর অশ্বমেধ। এরা তিন জনেই রানী স্বর্ণস্যাক্‌রাণী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। সবাই যে তার সমান বন্ধু তা নয়। এদের মধ্যে দারা সিং মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে যাকে বলে শত্রুতা, তাই করেছে। গম্বুজের মনে পড়ল, একবার স্কুলের পিক্‌নিকে দারা সিং তাকে একটা গাছের ডালে তুলে এমন নাড়া দিচ্ছিল যে যদি হাত দুখানা একবার ফস্‌কে যায় তো ছিটকে কোথায় গিয়ে পড়বে তা জানার কারোও সাধ্যি নেই।

এই দারা সিং একবার পিঠ দিয়ে একটা সট্ রুখে তার নিশ্চিত একটা গোল বাঁচিয়ে দিয়েছে। আরেকবার স্কুলের স্পোর্টসের সময় দারা সিং তাকে এমন ভাবে গার্ড দিয়ে রেখেছিল যে দড়ির কাছে এসেও ছুঁতে পারল না। দারা সিং তার প্রাণের বন্ধু একজনকে ফার্‌সট্ করে দিয়েছিল! চোখে জল এসেছিল, রাগে হাত পা ছুঁড়ে ছিল। কিন্তু উপায় নেই; দারা সিং কলকাতার আর কলকাতার বাইরের সমস্ত স্কুলের ছেলেদের মধ্যে বছরের পর বছর হেভিওয়েট্ চ্যাম্‌পিয়নসিপ্ পেয়ে আসছে। আসল নাম হচ্ছে দ্বারকানিবাসী সিংহ। চেহারার উপযুক্ত নাম বাড়ি-থেকে-পাওয়া নামের মধ্যেই ছিল! তাই ছদ্মনাম দারা সিং হয়ে দাঁড়াল আসল নাম, আর আসল নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে ছদ্মনাম।

কিন্তু এত রাগ সত্ত্বেও গম্বুজ শেষ পর্যন্ত ভাবল, কাজের সময় চাই একতা। শত্রুমিত্র এই ভেদাভেদ ভুলে দল পাকাতে হবে। এক জোটে কাজ করতে হবে। তাই দারা সিংকে অগ্নিবাণ ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটির একজন বিশিষ্ট কর্মী হিসেবে পাওয়া দরকার। এখন তো আর ছেলে হয়ে ছেলের সঙ্গে লড়াই নয়, ছেলে হয়ে বুড়োর সঙ্গে লড়াই। আর লড়াই যে কবে, কী ভাবে শেষ হবে, তা বলা কঠিন। এ লড়াই তো আজকের বলে নয়, কতোদিনের কে জানে!

অগ্নিবাণ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তোমার ক্যাবিনেট কবে তৈরী হচ্ছে হে! বাছাই পাঁচ জনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি কাজে নেমে পড়। সত্য তোমার পার্সোনাল এ্যাসিস্‌ট্যান্‌ট প্লাস্ বেয়ারা দু-জনের কাজই করে দেবে।

সে নিজে আর তিন জন তো ঠিকই হয়ে গেল একরকম। এক রকম কেন, ঠিকই হয়ে গেল। সে নিজেকে বাদে, দারা সিং নরাধম আর অশ্বমেধ এ তিনজনকে নেবেই। আর একজনের নাম সে কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। নাম কতকগুলো মনে এল বটে কিন্তু পছন্দসই হল না একটাও। তাই পাঁচজনের চার জনকে পাওয়া গেলেও, একজনকে এখনও দরকার। কোথায় আছ বাপু চটপট বেরিয়ে পড়না, মনে মনে ভাবল গম্বুজ।

গম্বুজ তারপর চিন্তা করে দেখল, আগে এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরামর্শ করে দেখতে হবে, তারপর অগ্নিবাণকে জানাতে হবে, অগ্নিবাণের সঙ্গে এদের পরিচয় করাতে হবে।

দারা সিং-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে কোন লজ্জা নেই। পরিচিত হওয়ার মতই যোগ্য ছেলে। দলের ও একাই একশো।

নরাধম লাজুক বটে তবে ওদের কাজে সেও কম লাগবে না। বইপত্তর সম্পর্কে ওর মত খুঁটিনাটি খবর আর কেউ রাখে না। সংস্কৃতর টিচারকে ও একদিন বলেছিল, স্যার ছেলেবেলা থেকে জেনে আসছি, এই সেদিনও পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল, নরাধম মানে নর্দমা। সংস্কৃতর টিচার সর্বভুক সেনশাস্ত্রী হেসে বলেছিলেন, অর্থ যা করেছ যথার্থই বটে. তবে তোমার নাম নরোত্তম না-হয়ে নরাধম হওয়াই বাঞ্ছনীয় বাপু!

নরাধম ছেলেদের উপযোগী ও দরকারী যাবতীয় বইয়ের খবর রাখে। দেশের লোকসংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে শহরের কোথাও আর স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। তাই ছোটদের উপযোগী করে লেখা, 'ট্র্যামেবাসে বসবাস' নামে যে-বইখানা এই সেদিন বেরিয়েছে, তার খবরও নরাধম রাখে। এ ছাড়া, 'লঙ্কায় অঙ্কের ঝাল', 'স্পুটনিকে ভারতভ্রমণ' 'স্পুটনিকে বিশ্বপরিভ্রমণ', এসব বইয়ের আপ্-টু-ডেট্ খবরও তার নখের আগায়।

আর অশ্বমেধ সত্যি সত্যিই যুধিষ্ঠিরের মত ধীর স্থির আর বুদ্ধিমান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সিংহাসন পেয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। যেদিন অশ্বমেধযজ্ঞ হয় এবং যে-মাসে, আজ থেকে প্রায় তের বছর আগে সেই মাসের সেই দিনটিতে জন্ম হয়েছিল বলে নাম অশ্বমেধ। ঠিকুজিতে নাকি এমন কথাও ছিল যে ঠিক আর আড়াই সেকেন্ড্ আগে যদি জন্ম হত তবে সে-ই হত সত্যযুগের সবচেয়ে বড় নেতা। অশ্বমেধের সবচেয়ে বড়গুণ সে ভবিষ্যতের কথা অনেক সময় বর্তমানে বলে দিতে পারে। সে নিজে পরীক্ষায় ভাল না-করতে পারলেও অনেক সময় বন্ধু বান্ধবদের জন্যে

কোশ্চেন্ আউট করে দিয়েছে। ছেলেরা অশ্বমেধের কথা উঠলে প্রথমেই বলে ঃ জ্ঞানী গুণী অশ্বমেধ, পাঠ করেছেন চারশো বেদ।

দারা সিং, নরাধম আর অশ্বমেধ সবাই একই ক্লাসের ছাত্র না-হলেও রানী স্বর্ণস্যাঁক্‌রাণী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। এদের মধ্যে নরাধম গ্যাঁট্ হয়ে সেই যে একই ক্লাসে বসে আছে সেখান থেকে তার নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই। সর্বভুক সেনশাস্ত্রী একদিন নাকি তাকে ঠাট্টা করে বলেও ছিলেন, রে নরাধম! বাপু একটি কথা বলি তোমায়। মহাজ্ঞানী বুদ্ধ মানুষের দুঃখকষ্টে বিচলিত হয়ে সংসারত্যাগী হয়েছিলেন। তোমায় সংসার ত্যাগ করতে বলিনা, গৃহত্যাগী হতেও বলিনা। পাঁচ বছরের চুক্তিতে যে-ক্লাস থেকে আর নড়তে চাওনা সেই ক্লাস ত্যাগ কর তো বাপু!

তিনজনকেই অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কথা বলল গম্বুজ। কি তারা করতে চায়, কত বড় তাদের উদ্দেশ্য। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে ছেলেরা যা করতে চায়, কোন দিনও তা করা হবে না। বুড়োরাও যতো বুড়ো হবে ততই তাদের গোঁ বাড়বে। এই তো স্বাধীনতার পর এত গুলো বছর গেল। হ'লটা কি! ছেলেরা যেমন আছে তেমনি আছে। বুড়োরা আরও বুড়ো হয়েছে। আর নিজেদের ভালমন্দ সব বেশি করে গুছিয়েছে। তারা যদি সবাই রাজী থাকে তো সে আজই ফোন করবে অগ্নিবাণ ব্রহ্মকে। গম্বুজের কথা সবাই খুব মন দিয়ে শুনেছে। তাই এক কথায় রাজী হয়ে গেল। একটা কিছু করা দরকার, করতেই হবে। উঠে পড়ে লাগতে হবে। তিনজনেই হাত তুলে বলল, আমরা আছি। দারা সিং যে ভাবে হাত তুলল আর গলা ছাড়ল তাতে গম্বুজ খুবই ভরসা পেল।

গম্বুজ ফোন করল আগে, কথামত। অগ্নিবাণ হেসে বললেন, ফোনে তোমার গলা বেশ ভারিক্কি শোনায় তো হে। বুঝতেই প্যারিনি তুমি কথা বলছ! বেশ তো নিয়ে এস না তোমার বন্ধুদের। আলাপ করা যাবে।

অগ্নিবাণের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে গম্বুজ অগ্নিবাণ, সদা-

সত্যবান ও অগ্নিবাণের বাবা লেট্ সর্বনাম ব্রহ্মের কথা'ও তিন জনকে জানিয়ে রাখল।

দারা সিং নরাধম আর অশ্বমেধকে নিয়ে যখন পরমার্থপ্রাপ্তিযোগ স্ট্রীটে উপস্থিত হল, তখন দেখল সদাসত্য দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

সত্য হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে তাদের চারজনকে সোজা অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অফিস ঘরে এনে হাজির করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রহ্মমশাই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হল অগ্নিবাণ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, আবার দরকারী কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেনও বটে।

তিনি ঢুকতে তারা চারজন উঠে দাঁড়াল। অগ্নিবাণ, তাদের বসতে বললেন। তারপর নিজে একখানা চেয়ারে বসলেন।

গম্বুজের দিকে চেয়ে বললেন অগ্নিবাণ, ঝুটঝামেলার কি শেষ আছে! এখনও দু চারজন শেষ চেষ্টায় লেগে আছেন। এই তো এসেছিলেন একজন এক্স-এম. এল. এ, বুঝতে পারছ কী ব্যাপার।

গম্বুজের দিকে চেয়ে যখন হাসলেন অগ্নিবাণ, দারা সিং, নরাধম আর অশ্বমেধ ধরতে পারল না ব্যাপারটা কি হতে পারে!

গম্বুজ এক এক করে তিনজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অগ্নিবাণ ব্রহ্মের। সত্য দরজার পাহারায় রইল! পরিচয় শুনে অগ্নিবাণ হাসলেন, বললেন তাঁর খুশি না-হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে গম্বুজ নিজে যা ভাল বুঝবে তা-ই হবে।

গম্বুজ যখন বলল আর একজন ছেলে কোথায় পাওয়া যায়, অগ্নিবাণ বললেন একজন অবিশ্যি আমার খোঁজে আছে। বল তো খোঁজ পাঠাই সত্যকে দিয়ে।

—দেখাই যাক না, গম্বুজ ভারিক্কি চালে বলল তিন জনের দিকে চেয়ে। তিনজনই মাথা নেড়ে সায় দিল।

অগ্নিবাণ সদাসত্যকে ডেকে বললেন, যা তো রে সত্য, প্রাপ্তিযোগ স্ট্রীটের ফিফ্‌টি সিক্স্ ওয়ান্-থার্ড নাম্বার থেকে স্পর্শরত্নকে আমার নাম করে একবার ডেকে আনতো।

পরে চারজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝলে তো স্পর্শরত্ন? পরশরতন আর কি! শেষে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসলেন।

তারপর পরশরতনের কথা কিছু কিছু শোনালেন।

আসলে নাম ওর কানাকড়ি। ওর জন্মের সময় ওদের অবস্থা খুব পড়ে যায়। বাপ-মা মনের দুঃখে নাম রেখেছিল কানাকড়ি।

একদিন পরমার্থপ্রাপ্তিযোগ স্ট্রীটের গলির অন্ধকারে এক অন্ধ ভিখারী হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে ওর ঘাড়ে। আর যে-ই পড়া অমনি পায়ের নিচে কি যেন একটা মাড়ালো মনে হল। হাত দিয়ে সেটাকে তুলে সে কানাকড়িকে বলল, দেখ তো বাবা, কি এটা!

কানাকড়ি দেখল একটা আস্ত গোটা আধুলি মানে পঞ্চাশ নয়া পয়সা। ভিখারী আনন্দে হাত তুলে কানাকড়িকে আশীর্বাদ করল, বলল, তুমি পরশ রতন বাবা, তুমি পরশ রতন! আর সেই থেকে কানাকড়ি হয়ে গেল পরশরতন। শোনা যায় পরশরতনকে স্পর্শ করে আরও অনেকের নাকি ভাগ্য খুলে যায়। শেষকালে এ পাড়ার ধর্মসাক্ষী সিকদার ওর তেলের কলে পরশরতনকে সিদ্ধিদাতা গণেশের মত বসিয়ে রাখে। ধর্মসাক্ষীর নিজের কথা, ফল ভালই হচ্ছে। এ সবই শোনা কথা। তবে যতদূর জানি ওর ছবি আঁকার হাত ভারি চমৎকার। বিজ্ঞাপনে, মানে ছবির পোস্টারে তোমাদের কানাকড়িও খরচ হবে না। এই তো ধর্মসাক্ষীর ছবি কোন আর্টিস্ট আঁকতে চায় না। কিন্তু পরশরতন এমন আঁকল যে ধর্মসাক্ষী সিকদার নিজেই নিজেকে চিনতে পারেনি ছবি দেখে। সে কারণে খুব খুশি সিকদার মশাই। আমার মনে হয় ও তোমাদের বিশেষ কাজে লাগবে। আর খরচ বাঁচানো মানেই তো সঞ্চয়। ভূদেববাবুর কথাই তো আছে, অপচয় বন্ধ করা মানেই তো সঞ্চয়। তোমরা এখন আর পড়না ওসব লেখা, না?

অগ্নিবাণের শেষ কথায় সবাই একটু আধটু লজ্জা পেলেও নরাধম কি বলতে যাচ্ছিল। গম্বুজ চোখ টিপে দিতে সে থেমে গেল।

সদাসত্যর সঙ্গে পরশরতন এসে হাজির হল যথাসময়ে। টিংটিঙে

লম্বা চেহারা। কিন্তু পায়ের জুতো যেমনি মোটা তেমনি ভারী। মনে হয় জুতো পরেনি, জুতোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বুক পকেটে অন্তত আধ ডজন পেন্‌সিল। হাফসার্ট পরেছিল, তাই হাতে বাঁধা ছোট বড় কম বেশি গোটা আট দশ মাদুলি সুতোয় ঝুলছে চোখে পড়ে।

অগ্নিবাণ সংক্ষেপে গুছিয়ে সব কথা বললেন পরশরতনকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কথা হচ্ছে, সিকদার মশাই কি ছাড়বেন তোমাকে ?

পরশরতন হ্যাঁ-না করে শেষ পর্যন্ত যা বলল তাতে বোঝা গেল, সে ধর্মসাক্ষীর তেলের কলে তো আর চিরদিন বসে থাকতে পারে না। তা ছাড়া এমন একটা দলের সঙ্গে কাজ করতে পারলে তার মাথা নিশ্চিত আরও বেশি খুলে যাবে। অতএব সে চান্‌স মিস্ করতে চায় না। অগ্নিবাণ এইবার গম্বুজের দিকে চেয়ে বললেন, তা হলে গম্বুজ ?

গম্বুজ কথা বলল না, শুধু হাসল।

অগ্নিবাণ বুঝি হাঁফ ছেড়ে বললেন, যাক তা হলে পাঁচটা নামই পাওয়া গেল। এক গম্বুজ, দুই দারা সিং, তিন নরাধম, চার অশ্বমেধ পাঁচ পরশরতন। সবচেয়ে বড় ব্যাপারটাই যখন চুকে গেল তখন আর অহেতুক বিলম্ব কেন, তোমরা সামনে কোন একটা দিন টিন দেখে তোমাদের ফার্‌সট্ মিটিং কল কর।

সদাসত্য এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এখন বলল, সামনের বেস্পতিবার ভাল দিন পড়ছে কত্তা। বড় কত্তা ওই দিন মাংস ছেড়ে নেরামিষ ধরেছিলেন, অহিংস্সুক হয়েছিলেন।

অগ্নিবাণ ওর কথা শুনে হাসলেন, বললেন, আমার বাবার কথা বলছে সত্য। অহিংস্সুক মানে বুঝলে তো, অহিংস। কথার শেষে হো-হো করে হাসলেন আরও কয়েক সেকেন্‌ড্।

গম্বুজ, সদাসত্যর কথামত সামনের বৃহস্পতিবার আর চারজনকে নিয়ে অগ্নিবাণ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির অফিসে আসছে, এই কথা দিয়ে সেদিনকার মত উঠল।

সদাসত্য মাথা খাটিয়ে এর মধ্যে একটা কাজ করে ফেলল।

পোস্‌ট অফিসের স্টাম্পে বা টাকা-পয়সার গায়ে রাজরাজড়া বা বড় বড় লোকের মুখের ছাপ থাকে যেমন, সেই রকম কত্তা অগ্নিবাণ ব্রহ্মের মুখের ছাপ-দেওয়া ফোর্টিন ক্যারেট্‌-গোল্‌ডের ও অর্ধেক সোনার পাঁচটা ব্যাজ্‌ তৈরি করিয়ে আনল। অগ্নিবাণ আপত্তি করেছেন, বলেছেন, আবার এসব কেন সত্য, শুধু শুধু খরচা।

বাবুর পায়ে ডবল মোজা পরাতে পরাতে সত্য মাথা নিচু করে বলেছে, কত্তা, হিসেব যখন আমার হাতে, কিছু চিন্তা করবেন না। বলেন কত্তা, অক্ষর থাকবে কয়টা।

অগ্নিবাণ প্রথমটায় ধরতে পারেন না। পরে হেসে বললেন, ও! তিনটে অক্ষর, এ. ডব্‌লিউ এস্‌ অর্থাৎ অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

ক্যারেট্‌ গোল্‌ডের ব্যাজ্‌। অগ্নিবাণ ব্রহ্মের মুখের ছাপ আর তার সঙ্গে এ. ডব্‌লিউ. এস. এই তিনটে অক্ষর। সদাসত্য পাঁচজনের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যাজ্‌ পৌঁছে দিয়ে এসে বাবুকে বলল, এ না হলে কি আর দলের লোককে চেনা যায় কত্তা!

গম্বুজ থেকে পরশরতন সবাই বেজায় খুশি হল ব্যাপারটায়। সদাসত্য অফিসঘর কদিন আগে থেকেই গোছগাছ করে রেখেছে, যাকে বলে ঠিক ফাইনাল গোছগাছ; মিটিং কল্‌ করলেই হয়।

একে একে পাঁচজনেই যথাসময়ে এসে হাজির। অগ্নিবাণ তৈরিই ছিলেন। মোটামুটি দরকারী কথাগুলো মনে মনে একবার ভেঁজে নিচ্ছিলেন। সত্য খবর দিতেই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অগ্নিবাণ হাত নেড়ে বসতে বললেন সকলকে। গম্বুজ বলল, আপনি আগে কিছু বলুন আমাদের।

অগ্নিবাণ মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, তোমাদের ব্যাপার, তোমরাই আলাপ আলোচনা করে ঠিক করবে। আমি শুধু দু-চারটে কথা বলব যাতে সবাই বুঝতে পারে এই ওয়েল্‌—

সবাই একসঙ্গে বলল, আপনি শুরু করুন।

বক্তৃতা শুরু করার আগে জাতবক্তারা যেমন নড়ে চড়ে বসে গলা

সাফ করে হাত-পা সোজা করে নেন, অগ্নিবাণও সেই রকম করলেন। তারপর আরম্ভ হল তাঁর কথা :

এই যে ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, তা কাদের কল্যাণের জন্যে? তোমরা যারা ছোট, অর্থাৎ বুড়ো হতে যাদের এখনও অনেক দেরি, তাদেরই জন্যে এই সোসাইটি, বুড়োরা তোমাদের স্বার্থ কোনদিনও দেখবে না। যত দিন যাবে, বুড়োরা আরও যত বুড়ো হবে, নিজেদের ভালমন্দ ষোলআনা বুঝে নেবে। এমন একজনও বুড়ো পাবে না যে তোমাদের পক্ষে এক কথায় সোজা হাত তুলবে। আমার কথা বাদ দাও, আমি বুড়ো হয়েও বুড়োদের কেউ নই! তোমরা যদি নিজেদের জোরে নিজেরা দাঁড়াতে পার, তো তোমাদের মত ছোট ছেলেও বোধ হয় কেউ আমার মত খুশি হবে না।

অগ্নিবাণ একটুখানি থামলে, পাঁচজনে ভাবল, বুড়ো হয়ে যে এমন বুড়োদের সঙ্গে লড়াই করা যায়, বুড়োদের বিরুদ্ধে নালিশ করা যায়, অগ্নিবাণকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সমস্ত বুড়ো যদি এমন বুড়ো হত তাহলে তাদের লড়াই করতে হত না, ওয়েলফেয়ার সোসাইটিরও দরকার হত না।

অগ্নিবাণ আবার আরম্ভ করলেন, আমি আশা করব তোমরা তোমাদের পঞ্চ পরিকল্পনা শুধু কল্পনায় রেখে দেবে না, হাতে-কলমে কাজে লাগাবে। বেশি পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামা অনুচিত। কোন পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে দাঁড়ায় না, শুধু লোকহাসান, ঠাট্টা আর হাততালি। তোমরা দেখে শেখ, ঠেকে শিখে আর লাভ কি! আর তেমন সুদিন যদি কখনও তোমাদের আসে, তাহলে বার্ষিকী কেন, দৈনিক পরিকল্পনা তোমরা কর, তাতে দেশের ভালো বই মন্দ তো কিছু নয়। আমার আর বেশি কিছু বলার নেই। তোমরা তোমাদের চেষ্টায় সফল হও, এই কামনাই করি। আমার আশীর্বাদ তো পাবেই, আমার বাবা লেট্ সর্বনাম ব্রহ্মের আশীর্বাদও তোমরা নিশ্চয় পাবে।

দারাসিং আর পরশরতন হাততালি দিতে যাচ্ছিল, গম্বুজ চোখ

টিপতেই তারা থেমে গেল। একি মাঠের সভা যে বক্তৃতা শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়বে! এ হচ্ছে ঘরের গোপন সভা।

কথা শেষ হলে অগ্নিবাণ সদাসত্যর কাছে এক গ্লাস জল খেতে চাইলেন, আর কথা আরম্ভ করার আগে গম্বুজ সত্যর কাছ থেকে এক গ্লাস জল চাইল।

অগ্নিবাণের কথা শুনতে শুনতে গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল গম্বুজের। জলের গ্লাস শেষ করে গম্বুজ আরম্ভ করল।

আমরা সবাই এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি আমাদের অর্থাৎ অগ্নিবাণ ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটির লক্ষ্য কি। আমি সে কারণে বাজে কথায় যাব না। আমাদের প্ল্যান গুলো এক এক করে বলে যাব।

আমাদের পঞ্চ পরিকল্পনার এক নম্বর হচ্ছে, নিজেদের স্টেডিয়াম চাই। অবৈতনিক স্কুল যে চাই না তা নয়, তবে স্টেডিয়াম চাই আগে। তাই শহরের যেখানেই তাস দাবা পাশা ঐ সবের ক্লাব দেখব আমরা সেখানেই হামলা করব এবং সেই সব ক্লাব তুলে দেব। দু-নম্বর হচ্ছে, নিজেদের লাইব্রেরি চাই অর্থাৎ যাকে বলে গ্রন্থাগার। ন্যাশানাল লাইব্রেরির মত আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার। আমাদের বলতে শুধু আমাদেরই। তিন নম্বর হল, থিয়েটার সিনেমা ডান্‌স-ড্রামা এ সব কিছুতে আমাদের সুযোগ চাই। মানে আমাদের সুযোগ সুবিধে দিতে হবে। বড় এবং বুড়ো আর্টিস্‌ট্‌দের মত বেতনও আমাদের দিতে হবে।

চার নম্বর হচ্ছে, বিধান সভায় আমাদের দুজন সভ্য থাকা চাই। আমরাই তাদের নির্বাচন করব। তারা অবশ্যই যোগ্য ছেলে হবে।

পাঁচ নম্বর এবং শেষ, হচ্ছে—আমাদের নিজেদের ভাষা থাকা চাই। মানে হল কিনা ইংরেজি-হিন্দী-বাংলা উর্দু সব কিছু মিশিয়ে সুবিধে মত একটা নিজস্ব ভাষা। ব্যাপারটা কি আমি আরেকটা মিটিং-এ আরও ভাল করে বলব।

এখন কথা হচ্ছে আমরা কে কোন কাজের ভার নিতে পারব, অর্থাৎ কাকে দিয়ে কোন কাজটা সবচেয়ে ভাল হবে তা-ই দেখতে হবে।

—ঠিক বলেছ, খাঁটি কথা বলেছ। কাজ তো আছে, কাজের লোক কোথায় ? অগ্নিবাণ পাঁচ জনের দিকেই এক এক বার তাকালেন।

গম্বুজ মন দিয়ে শুনেছিল অগ্নিবাণের কথা। সবাইকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, আমরা আমাদের কাজের কতখানি যোগ্য এইবার তার প্রমাণ দিতে হবে। সে কালে রূপকথার রাজপুত্তুর আর তাঁর তিন বন্ধু, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র আর সদাগরপুত্র, যেমন এক এক দিকে বেরিয়ে পড়তেন, সেই রকম আমরা পাঁচজনেও নিজেদের কাজ বুঝে নিয়ে এ শহর চষে বেড়াব।

কার কাজ কতখানি এগোল তার হিসেব থাকবে সদাসত্যর কাছে। আর মাঝে মাঝে মিটিং করে বক্তৃতা দিয়ে কাজ ভুল হচ্ছে, না ঠিকই আছে, এ সব আলোচনা আর তর্ক করে ঠিক করতে হবে। মনে রাখতে হবে কাজ যতো তাড়াতাড়ি আমরা গুছিয়ে নিতে পারব, বুড়োরা ততই পিছু হটবে। গম্বুজ, এই সময় সভয়ে একটিবার অগ্নিবাণের দিকে তাকিয়েছে। অগ্নিবাণ হেসে মাথা নেড়েছেন, অর্থাৎ নির্ভয়ে বলে যাও।

গম্বুজ কথা শেষ করল এই বলে, আগামী মিটিং-এ আমরা ঠিক করব কে কোন কাজের ভার নেবে। অগ্নিবাণ গম্বুজকে বলেছিলেন, দেখ গম্বুজ, সবচেয়ে দরকারী কাজটায় কিন্তু হিসেবের গোলমাল না হয়। মনে রেখ, যার যা কাজ সে যদি ঠিক সেই কাজের ভার পায় তবে সরকার মানে গভর্নমেন্ট্ ঠিক চলবে। আর তা যদি না হয়, সরকার আর চরকার মত ঘুরবে না। গরুর গাড়ির চাকার মত তিনশো পঁয়ষট্টি মিনিটে একটিবার ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ তুলবে।

অগ্নিবাণের কথা শোনবার পর গম্বুজ মাথা নিচু করে রইল। তারপর ভেবে চিন্তে বলল, আজ্ঞে, কাজের প্রমাণ না পেলে আমরা তাকে তার পোজিসনে রাখব কেন ?

—ঠিক বলেছ। এই যে দেখ না বড় বড় ব্যাপারে সব। একবার যাকে বসিয়ে দিল এক জায়গায় সে আর সেখান থেকে নড়তে চায়না। তা সে বোবাই হোক আর অন্ধই হোক। অগ্নিবাণ গম্বুজের কথা খুব তারিফ করেছেন এমন করে বললেন।

গ্রীষ্মের রোদ্দুর পার হয়ে, বর্ষার স্যাঁতসেঁতে দিনগুলো পেরিয়ে, এখন সবাই শরতের ঝকঝকে মাজাঘষা আকাশের মুখ দেখতে পেল এত দিনে। অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির দু নম্বর মানে খুব দরকারী মিটিং বসবার আগে সবাই বুঝি একটু তাজা রোদের অপেক্ষায় অপেক্ষায় ছিল। অগ্নিবাণ যে অগ্নিবাণ তিনিও ডবল মোজা ছেড়ে একজোড়া মোজাই পরলেন! তাঁরও পায়ে কোথা থেকে জোর এসেছে। সবাই একবাক্যে বলল, একেই বলে আশ্বিনের রোদ্দুর, একেই বলে শরতের আকাশ। সদাসত্যও বাবুর নামে গান বেঁধে ফেলল।

বর্ষাকালে বসেছিলাম অগ্নিবাণের ছাতায়
আশ্বিনের ঘুঘু আমি, এখন গাছের মাথায়।

দলের আর পাঁচজনের মতো অগ্নিবাণও সদাসত্যর গান শুনে মজা পেলেন। নকল দাঁতের দুপাটি মুখে শক্ত করে এঁটে হো-হো করে হাসলেন।

ক্যালেণ্ডারে দিন দেখে আবার একদিন মিটিং ডাকা হল। সংবাদ ভাণ্ডারে সত্য চুপি চুপি খবরটা ছাপিয়ে দিয়েছিল। ঠিকানার একটা অক্ষরও ছিল না। শুধু ছাপা হয়েছে, অগ্নিবাণ ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটির অতি জরুরী গোপনতম মিটিং।

গম্বুজ, দারাসিং, নরাধম, অশ্বমেধ আর পরশরতন সবাই এ. ডব্‌লিউ. এস-মার্কা চক্‌চকে ব্যাজ্‌ পরে এসে উপস্থিত।

গম্বুজ বলল, আজকের মিটিং যেমন জরুরী তেমনই প্রাইভেট। মনে রাখতে হবে কাজের ভার যেমন নিতে হবে সেই রকম পেটের কথা মুখে আসবে না। বড় বড় যুদ্ধের সময় গুপ্তচরেরা চুপিসাড়ে হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করে, শত্রুপক্ষ টের পায় না, সেই ভাবে মুখ টিপে কাজ করতে হবে। বুড়োর দলকে স্থলে জলে আকাশে ছলে বলে আচ্ছাসে জব্দ করতে হবে।

আমাদের এক একজনকে এক একটা কাজের ভার নিতে হবে। অথচ সবাই সবাইকে নিজের কাজের খবর দেবে, কার কাজ কতটা এগোল তার খোঁজ নেবে। মাঝে মাঝে মিটিং কল করে কাজের রিপোর্ট

দিতে হবে। সেই রিপোর্ট দেখে ঠিক হবে যে সে কাজের যোগ্য কিনা। তার কাজে ভুল হচ্ছে কিনা।

দারা সিং এই সময় নিজের দু হাত টিপে টিপে দেখছিল, শক্তি পরীক্ষা করছিল। সদাসত্য সেদিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসছিল। ভাবখানা এই—তোমাকে তোমার যোগ্য কাজেই দেওয়া হবে।

ঠিক এই সময় গম্বুজ ঘোষণা করল, তাস দাবা পাশা এ সব কিছু তুলে দিয়ে স্টেডিয়াম বসানোর ভার নিতে হবে তোমাকেই দারাসিং ওরফে দ্বারকানিবাসী সিংহ।

দারাসিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল গম্বুজের কথায়।

গম্বুজ তাকে চেয়ারে বসতে বলল। দারাসিং চেয়ারে ভাল করে বসলে, গম্বুজ বলল, তোমার কাজেই সবচেয়ে বেশি শক্তি পরীক্ষা। কোন বুড়োই তাসদাবার আড্ডা বা ক্লাব উঠে যাক তা চায় না। অথচ তুলতেই হবে, কারণ স্টেডিয়াম আমাদের চাই-ই। সেইজন্যে লড়াই বাধবে। চট করে বুড়োদের ঘাড়ে গিয়ে পড়বার দরকার নেই। আগে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা কর, কী চাই আমরা। যদি কোন ফল না হয় তো –আমরা সবাই পড়েছি এবং বিশ্বাসও করি ঃ

আর বল সে বলীকে বলী কেবা কয়
কার্যকালে যার শক্তি কার্যকরী নয়।

এমন উৎপাত করতে হবে যে বুড়োরা রাগে দুঃখে দাবার ছক কিংবা তাসের প্যাকেট ছেড়ে পালাবে। বুদ্ধি আর শক্তি খাটিয়ে তোমায় এ কাজের ভার নিতে হবে। দারাসিং এবার সত্যিই চেয়ার ছেড়ে উঠে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা হেঁট করল। অর্থাৎ এ কাজের দায়িত্ব সে মাথা পেতে নিল।

আমাদের দুনম্বর কাজের ভার তোমার ওপর। গম্বুজ নরাধমের দিকে চাইল। নরাধম চেয়ার ছেড়ে একটু দাঁড়িয়েই আবার বসল।

তোমার কাজে বুদ্ধির প্যাঁচই বেশি। দেখতে হবে শহরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে কত লাইব্রেরি আছে আর সেখানে আমাদের চাহিদা মত বই আছে কত। তালিকা তৈরী করতে হবে। একটু ফাঁক আর

সুযোগ পেলেই খুশি মত বই এক আধখানা লাইব্রেরিতে ঢুকিয়ে দাও। তারপর আস্তে আস্তে দেখ কোন কোন লাইব্রেরিতে তোমার পছন্দ করা বই মানে আমরা যে সব বই চাই, তাদের সংখ্যা বেশি। তোমার কাজ হবে এই করে সেই সব লাইব্রেরি থেকে আর যত রকমের বই আছে সমস্ত বার করে দেওয়া। এই ভাবে সেই সব যত লাইব্রেরি আছে আমাদের হাতে চলে আসবে একে একে! তারপর একদিন হবে কি জান, আমরা জোর গলায় বলতে পারব, আমাদের নিজেদের একখানা বাড়ি-জোড়া লাইব্রেরি চাই। চাই বললেই তো হবে না, প্রমাণ দিতে হবে হাতে হাতে। প্রমাণ তো তোমার হাতেই থাকবে তখন। হাজার গণ্ডা লাইব্রেরির নামের লিস্ট দিতে পারবে, বলতে পারবে এসব লাইব্রেরিতে আমরা যে সব বই পছন্দ করি তা-ই আছে শুধু! কী, পারবে না? গম্বুজ নরাধমের দিকে চাইল।

নরাধম কিছু বলার আগেই অগ্নিবাণ বললেন, পারবে না কেন, কাজে নামলেই ঠিক পারবে। আর অগ্নিবাণের কথা শুনে নরাধম সাহস পেয়ে বলল, আমার কাজে বুদ্ধির প্যাঁচই বেশি।

তিন নম্বরের কাজের কথায় যখন এল তখন গম্বুজ ইতস্তত করল। অগ্নিবাণ এই সুযোগে গম্বুজকে বললেন কথাগুলো, এই কাজের ভারটা কিন্তু নিতে হবে তোমায়। কারণ অভিনয় হচ্ছে আর্ট। তোমার কথাবার্তা, চটপটে ভাব, বুদ্ধি এসব দেখেশুনে আমার মনে হয়েছে তিন নম্বর কাজের দায়িত্বটা তোমাকেই পালন করতে হবে। অগ্নিবাণ যে হাসিঠাট্টা করছেন না তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়। বলতে বলতে মুখ তাঁর গম্ভীর হয়ে ওঠে। আরও গম্ভীর মুখ করে এবার বললেন অগ্নিবাণ, বুদ্ধির কথা কেন বলছি জান? এক এক জন এ্যাক্টর আছেন যাঁরা পার্ট ভুলে গেলেও নিজেরা পার্ট তৈরি করে নেন। যারা দেখে তারা বুঝতেও পারে না আসল পার্ট কি ছিল। বললে হয় তো তোমরা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমার নিজের চোখে দেখা। আমার বাবা লেট সর্বনাম তো রীতিমত তাঁর ভক্ত ছিলেন। তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, বাবা রোজ থিয়েটার কোম্পানীর কাছে

গিয়ে তাঁর খবর নিয়ে আসতেন। সেই এ্যাক্‌টর সুস্থ হয়ে বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কোম্পানীর কাছে বাবার ঠিকানা ছিল। সে এক গল্পই বটে—থাক সে কথা। যে কথা বলছিলাম, তিনি প্রায়ই নিজের পার্ট ভুলে যেতেন। কিন্তু থেমে থাকতেন না। মন থেকে পার্ট তৈরি করে বলে যেতেন গড় গড়। যারা দেখত তারা অবাক হয়ে শুনতো, বুঝতে পারত না। কেউ টুঁ ফুঁ করত না বা হৈ চৈ করে পয়সা ফেরত চাইত না। অনেক বয়েস হয়ে গেছে ওঁর। তাই ভেবেছি সমুদ্রমন্থন সমাজপতির কাছে তোমায় নিয়ে যাব। দরকারী উপদেশ দিতে ওঁর জুড়ি কেউ নেই। আজকালকার অনেক বড় বড় এ্যাক্‌টর ওঁর বাড়িতে দুটি বেলা আসে। তোমার সঙ্গে অনেকেরই আলাপ হয়ে যাবে। তুমি তাঁদের কাছে তোমার দাবীর কথা জানাতে পারবে, কি বল ?

অগ্নিবাণ কথা শেষ করলে গম্বুজ কিছু বলতে পারল না। মাথা নিচু করে তাঁর কথাগুলো ভাবার চেষ্টা করল। শেষ কালে মাথা তুলে বলল, তিন নম্বর কাজের কথা তা হলে হয়েই গেল। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তবে—

গম্বুজের আর কথা বলা হল না। কারণ এবার সত্যিসত্যিই হাত তালি পড়ল। দারাসিং, নরাধম, অশ্বমেধ আর পরশরতন চারজনে একসঙ্গে তালি দিল। অগ্নিবাণ খুশি হলেন। তিনি যে ঠিক লোককে বাছাই করেছেন তা সবাই বুঝতে পেরেছে। শেষকালে তিনি যখন হাততালি দিলেন তখন দেখাদেখি সদাসত্যও হাতে হাত ঠুকল।

গম্বুজ বলল, আমাদের চার নম্বর কাজের ভার পড়বে অশ্বমেধের ওপর। তুমিই ঠিক করবে দেশের নেতা হবার উপযুক্ত কারা, কারা বিধান সভার সভ্য হওয়ার উপযুক্ত। আমরা যখন কাজে নামব তখন অনেক বুদ্ধিমান চটপটে ছেলে আমাদের ওয়েল ফেয়ার সোসাইটিতে আসবে! তাদের মধ্যে থেকে দুজনকে তুমিই ঠিক করবে। তুমি উপকারী বন্ধু হিসেবে অনেকের কাছে খাতির পেয়েছ। কোশ্চেন জানতে না পারলে অনেকেই ফেল মেরে দিত। কিন্তু তুমিই বাঁচিয়েছ। আর এখন

এত বড় দরকারের সময় দুজন যোগ্য ছেলেকে বিধান সভায় পাঠাতে পারবে না ! বিধানসভায় এমন সব সভ্য আছে যারা বুড়োদের হয়ে লড়ে, আর ছেলেদের বলে অসভ্য। ছেলেদের হয়ে লড়বার কেউ নেই। তাই বাছাই করতে হবে এমন দুজন ছেলেকে যারা বুড়োদের পেলেই কোণঠাসা করবে। এখানে দারাসিং আর নরাধম আছে। তারা তোমার গুণের পরিচয় পেয়েছে।

নরাধম আর দারাসিং উঠে দাঁড়িয়ে স্বীকার করল তারা দুজনেই এ কথা মানে।

—এবারে আমরা পাঁচ নম্বরে আসতে পারি, এইটুকু মাত্র বলে গম্বুজ পরশরতনের দিকে চাইল। পরশরতন জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল, গম্বুজ বলল, বস বস। তুমি ধর্মসাক্ষী সিকদারের তেলের কলে সিদ্ধিদাতা গণেশের মত বসে থাকতে। হাজার রকম লোক তুমি দেখেছ। হাজার গণ্ডা ভাষা। তুমি যখন যে দরকারী কথাটা পাবে তা তোমার কথার ঝুলিতে পুরে রাখবে। তুমি যে ইচ্ছে করলেই তিনটে ভাষার একটা খিচুড়ি বানাতে পারবে তাতে আমার কানাকড়িও অবিশ্বাস নেই।

গম্বুজের কথা শুনে অগ্নিবাণ এবার না হেসে পারলেন না। বললেন, শোন হে কানাকড়ি, পরশরতন নামের পরিচয় দিতে হবে। রতনের স্পর্শ পেলে তিনটে ভাষা একটা ভাষায় দাঁড়াবে। ইংরেজি থেকে বাংলাকে তফাত করা যাবে না, আর বাংলা থেকে হিন্দিকে।

গম্বুজ এই ফাঁকে বলে রাখল, আরও একটা কাজের ভার তোমায় নিতে হবে। অগ্নিবাণ ব্রহ্মের একখানা ছবি তোমায় আঁকতে হবে। আমাদের ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ঘরে টাঙান থাকবে। দারাসিং, নরাধম, অশ্বমেধ তিনজনে দাঁড়িয়ে উঠে একবাক্যে মেনে নিল যত শীঘ্র সম্ভব অগ্নিবাণের ছবি চাই।

সদাসত্য এতক্ষণে কথা বলল আবার, কত্তাবাবুর ছবির পাশে থাকবে ফটোক। ভাল করে আঁকেন রতনবাবু।

অগ্নিবাণ সদাসত্যর কথায় লজ্জা পেলেন, বললেন, ছবিতে আমার

ডবল মোজাটাও এঁকো যেন। বুঝলি সত্য, ছবি আঁকার পর দেখবি, লেট্ সর্বনাম ব্রহ্মের মত আমিও লেট্ অগ্নিবাণ ব্রহ্ম হয়ে গেছি।

সত্যবান বাবুর কথা শুনে দুঃখ পাওয়ার বদলে কেমন যেন মজা পেল। বলল, বাবুর চেয়ে লেট কানে ভালো লাগে কত্তা, দশ জনকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন।

সদাসত্যর কথা শুনে সবাই একজোটে হো-হো করে হেসে উঠল।

সভা শেষ হওয়ার আগে অগ্নিবাণ আবার সকলকে তাদের কাজের কথা একটি বার করে মনে করিয়ে দিলেন।

সবাই জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শেষকালে লেট্ সর্বনাম ব্রহ্মের লেখা প্রার্থনা-সঙ্গীত অগ্নিবাণের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল সবাই :

হে ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সদাশক্তিমান
তোমাকে ভজনা করে ভক্ত সর্বনাম।
সর্ব জীবে সর্ব জিভে তুমি আছ বসে
তোমাকে স্মরণ ক'রে চাষা জমি চষে,
কণ্ঠে তোমার নাম নেবে ব্যবসায়ী
দ্বিপদ চতুষ্পদ আর স্তন্যপায়ী।
এ ব্রহ্মাণ্ডে বৃক্ষ কাণ্ডে কাদা মাটি জলে
পরমার্থপ্রাপ্তি যোগ স্ট্রীট্ অঞ্চলে
তোমার মহিমা প্রভু সর্বত্র উদ্দাম,
অবিভক্ত ভক্তি মাগে ভক্ত সর্বনাম॥

সবাই গান গাওয়া শেষ করলে অগ্নিবাণ মাথা নিচু করলেন, চোখ বুঁজলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেরও মাথা নিচু চোখ বন্ধ। শেষ কালে সদাসত্য শিস্ দিয়ে সিগন্যাল দিল যখন, সবাই মাথা তুলল, চোখ খুলল। কথা ছিল প্রার্থনার শেষে সদাসত্য সিগন্যাল দেবে।

এরপর সবাই উঠে পড়ছিল। অগ্নিবাণ বললেন আর একটু বসে যেতে হবে, সত্য খাওয়া-দাওয়া মানে জলযোগের যৎসামান্য ব্যবস্থা করেছে।

সত্য শুধু একটু মজা করল। সকলকে যা দিল তার ডবল দিল দারা সিং-কে।

কয়েকটা দিন পরেই কাজে লেগে গেল দারা সিং।

রানী স্বর্ণস্যাঁকরাণী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের জোয়ান ছেলে ক'জন রাতারাতি তার কাজের সঙ্গী হয়ে গেল। দারা সিং যেমন জোগাড় করল নিজের স্কুল থেকে তেমনই পাশাপাশি পাঠশালা আর হাইস্কুল থেকে। দশমহাবিদ্যা পাঠশালা থেকে নিল বজ্রবিশালকে আর হিজ রয়্যাল হাইনেস হাইস্কুল থেকে নিল পোটেটোপ্যান্ সিংরে অর্থাৎ পতিতপ্রাণ সিংহরায় নামে একজন ছেলেকে।

দারা সিং বজ্রবিশাল আর পতিতপ্রাণকে বলল, তারা কলকাতার বিখ্যাত তাসদাবাপাশার আড্ডা মানে ক্লাবগুলোকে খুঁজে বার করবে। তারপর এই সব আড্ডার বুড়ো বুড়ো খেলোয়াড়দের কায়দা করে পাকড়াও করবে। শেষকালে তাদের এমন জব্দ আর নাস্তনাবুদ করে ছাড়বে যে তাস দাবার আড্ডা না ছেড়ে দিয়ে পারবে না। পুলিশ যেমন চোর জুয়াচোর বদমাস গুণ্ডাদের আড্ডায় খানাতল্লাসী করে, তারাও তেমনি পুলিশের মত কাজ করবে বুড়োদের বিরুদ্ধে।

কলকাতা শহরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সীমানায় টহল দিল তিন জনে, দারা সিং পতিতপ্রাণ আর বজ্রবিশাল। দশমহাবিদ্যা পাঠশালার হেডপণ্ডিত আর হিজ রয়্যাল হাইনেস হাইস্কুলের হেডমাস্টার দুজনে মিলে রানী স্বর্ণস্যাঁকরানী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুতবাবু ইন্দ্রপ্রস্থ পুরকায়স্থের কাছে লম্বা অভিযোগ পাঠালেন। চিঠিতে লিখছেন, সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র দারা সিং মানে দ্বারকানিবাসী তাঁদের বিদ্যালয়ের স্টুডেণ্ট্‌দের হিংস্র কাজে নিযুক্ত করেছে। এ ছাড়া এই দুজন ভালো খেলোয়াড়কে স্কুলের মাঠে দরকারের সময় দেখতে পাওয়া যায় না। এতে স্কুলের ক্ষতি হচ্ছে।

দারা সিং গম্বুজকে দিয়ে চিঠির উত্তর দিল। ওদের দুজনের

ওপর হামলা এলে ওরা চট্‌পট্‌ স্বর্ণ স্যাঁকরাণীর ছাত্র হয়ে যাবে। সেটা কি ভালো হবে ?

ভয়ে ব্যাপারটা যখন চাপা পড়ে গেল, তিনজনের কাজের বেগ আরও বেড়ে গেল। দারা সিং-এর কথামত পতিতপ্রাণ আর বজ্রবিশাল উত্তর আর দক্ষিণে দুটো নামকরা ক্লাবের গায়ে এই বিজ্ঞাপন এঁটে দিয়ে এল :

তাস-দাবা-পাশা
খেলতে লাগে খাসা
তবু ছাড়তে হবে বাসা
আর তো নাহি আশা
আমরা এসে গেছি
এবার ভীষণ চেঁচামেচি
বাঘ পড়েছে পালে
এবার পড়বে বোমা চালে
পালাও তাড়াতাড়ি
নইলে দারা সিং-এর দাড়ি
বজ্র বিশাল ছাড়ি—

পোটেটোপ্যান্ সিং রে
নেবে তোমায় নিংড়ে।

আসলে এ দুটো ক্লাব একই ক্লাবের দুটো ব্র্যান্‌চ, একটা শহরের উত্তরে, আরেকটা দক্ষিণে। উত্তরায়ণ রায় (জুনিয়র) আলস্যঅভ্যাস সমিতির উত্তর ব্র্যান্‌চের সেক্রেটারি, আর দক্ষিণায়ণ দীক্ষিত (মেজর) দক্ষিণ ব্র্যান্‌চের। দীক্ষিতের বয়স সত্তরেরও বেশি। তাঁর ছেলে, অগ্নিবাণের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট, দক্ষিণায়ণ দীক্ষিত (মাইনর) দাবা খেলায় বেঙ্গল চ্যাম্‌পিয়ন।

যা-ই হোক রায় মশাই ক্লাবের দরজার গায়ে বিজ্ঞাপন দেখেই অন্য ব্র্যান্‌চে ফোন করেছেন। দীক্ষিত (মাইনর) ফোন ধরেছে।

বলেছে, আজ্ঞে বাবা আপনাকে এইমাত্র ফোন করতে যাচ্ছিলেন। কারণ এদিকের ব্র্যান্‌চেও তো একই দশা। আচ্ছা কী লিখেছে বলুন তো ? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে দীক্ষিত মাইনর।

রায় মশাই পুরো বিজ্ঞপ্তিটা ফোনে মুখ লাগিয়ে পড়ে গেলেন।

দীক্ষিত বলল, আজ্ঞে, ঠিক একই কথা এদিকেও !

আলস্যঅভ্যাস সমিতির উত্তর ও দক্ষিণ ব্র্যান্‌চ দুটোই খুব ঘাবড়ে গেল।

পতিতপ্রাণ উত্তর ব্র্যান্‌চে গিয়ে রায়মশায়ের সঙ্গে দেখা করল এক সন্ধ্যেবেলা।

আলস্যঅভ্যাস সমিতির সদস্যরা তখন তাস আর দাবায় রীতিমত জমে উঠেছেন। পতিতপ্রাণ সোজা ক্লাবের দারোরানকে ডেকে বলল, ক্লাবের সেক্রেটারিকে গিয়ে বল, অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির লোক দেখা করতে চায়।

দারোয়ান মনে করল চাঁদা চাইতে এসেছে হয়তো বা।

দারোয়ান আগে ভেতরে খবর দিল, তারপর দু চার মিনিটের মধ্যেই ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল।

উত্তরায়ণ রায় পতিতপ্রাণকে বসতে বললেন, পরে নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

পতিতপ্রাণ বলল, পোটেটোপ্যান্ সিংরে।

—কী বললে ? কান বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আবার রায়মশাই ?

—পতিতপ্রাণ সিংহ রায়, স্পষ্ট করে বলল পতিতপ্রাণ।

—তা-ই বল, আগে কি যেন বললে একটা ! হাসার চেষ্টা করলেন রায়মশাই।

—আজ্ঞে পোটেটোপ্যান সিংরে বললেই বেশি লোকে আমাকে চিন্‌বে।

—যাক্‌গে, পোটেটোই হও আর টমেটোই হও, টাকা তো মোটেও বার করতে পারছি না এখন। কারণ এ্যাট্ প্রেজেন্‌ট আমরা বড় বিপদে পড়েছি।

—টাকা ? খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল পোটেটো।

—চাঁদা চাও তো—হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, কোন একটা দল ভয় দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চায় মনে হচ্ছে। যাকে বলে ব্ল্যাক মেইলিং। এই দেখনা, না হলে এমন সব কথা কেউ শোনায়, বলে সমস্ত বিজ্ঞাপনটা মুখস্ত বলে গেলেন রায়মশাই। একটু থেমে বললেন, তাই বলছিলাম, আমরা তো আর ক্লাব ছেড়ে সবাই উঠে যেতে পারিনা বুড়োর দল ! তাই মোটারকম টাকা তোলার চেষ্টায় আছি সবাই। দরকার হলে টাকাই দিয়ে দিতে হবে। সেইজন্যে বাবা তোমায় বলছিলাম দুটো দিন অপেক্ষা করতে।

পোটেটো এককথায় কিছু বলল না। ভেবে দেখার চেষ্টা করল কথাগুলো। টাকাকড়ির ব্যাপারে গেলে পুলিশের হাঙ্গামা হতে পারে। তাছাড়া দারা সিং-এর নির্দেশও সে রকম নয় !

তাই পতিতপ্রাণ যখন ব্যাপারটা খুলেই বলবে ভাবছে, হঠাৎ উত্তয়ায়ণ রায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন কি একটা ভেবে, তোমার নামটা কী বললে যেন ?

—আজ্ঞে পতিতপ্রাণ সিংহ রায়।

—আরে না না ওটা কেন—

—ও বুঝেছি, পোটেটোপ্যান্ সিংরে।

—তোমার এ নামটা আছে না বিজ্ঞাপনে ?

—আজ্ঞে ওটা আপনার মুখস্থ জানলে ওই নামটা কি আর বলতাম !

—দেন্ ইউ আর পোটেটোপ্যান্ !

—আজ্ঞে তা বলতে পারেন, খুব ভক্তি করে বলল পতিতপ্রাণ।

—তোমরা হলে কি না ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ! রায় মশাই অবাক হয়েছেন এমন ভাবে বললেন।

—আজ্ঞে, অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ব'লে একগাল হাসল পতিতপ্রাণ।

—তা কী তোমরা চাও ? এতক্ষণে চটে উঠেছেন রায়মশাই।

—আজ্ঞে এক কথায় বলা মুশকিল, আজ কি আপনার সময় হবে ?

—কবে বলতে চাও ?

—বলছিলাম, আপনি আগে আমাদের ছাপা বুলেটিন পড়ে দেখুন, আমাদের এক নম্বর দাবী কি, এই বলে কাগজের একটা ঠোঙা থেকে একখানা ছাপা বুলেটিন দিল উত্তরায়ণ রায়ের হাতে। তারপর, আসি, শুধু এইটুকু বলে উঠে পড়ল।

এদিকে বজ্রবিশাল দক্ষিণায়ণ দীক্ষিতের (মেজর) সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় এক কাণ্ড করলে। সে দশমহাবিদ্যাপাঠশালার হেডপণ্ডিতের কাছ থেকে সংস্কৃতে এক লম্বা কবিতা লিখে নিয়ে গেল। হেডপণ্ডিত মহার্ণব জ্ঞানপুষ্করিণী বিদ্যাবাচস্পতি সিদ্ধান্তবাগীশ বিশেষ দরকারে নানা উপলক্ষে কবিতা লিখে পয়সা রোজগার করেন। বজ্রবিশালও অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তহবিল থেকে হেড-পণ্ডিতকে আড়াই টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। জ্ঞানপুষ্করিণী মশাই আলস্যঅভ্যাস সমিতির বুড়ো বুড়ো মেম্বারদের খুব ঠাট্টা করে অনেক কথা লিখেছেন। শেষকালে লিখেছেন, স্টেডিয়াম্ সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি নগরে নগরে। তলায় অগ্নিবাণ ব্রহ্মের নাম। অর্থাৎ অগ্নিবাণ বলছেন, স্টেডিয়াম্ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমি নগরে নগরে আবির্ভূত হব। যেমন কলকাতা শহরে আমার বর্তমানে আবির্ভাব হয়েছে।

দীক্ষিত (মেজর) আবার সংস্কৃত খুব ভাল জানেন। দীক্ষিত (মাইনর) এজন্যে আবার বাবাকে বিশেষ পছন্দ করেন না। কিন্তু এখন দেখা গেল দীক্ষিত (মেজর) সংস্কৃত জেনে ভালই করেছেন। না-হলে মহার্ণব বিদ্যাবাচস্পতির লেখা পড়া আর তার মানে এমন চট করে বার করা শক্ত হত বই কি। দীক্ষিত বজ্রবিশালের হাত থেকে একখানা ছাপা কাগজে পড়লেন সিদ্ধান্তবাগীশের লেখা কবিতা। বললেন, পড়তে তো ভালই লাগছে বাপু, তবে এর অর্থই যত অনর্থের মূল। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অসাধুকে শাস্তি দেওয়া হবে আর সাধুকে রক্ষা করা হবে। তার মানে অগ্নিবাণ বলতে চান আমরা অসাধু। বেশ !

—আজ্ঞে কবিতায় তো সেরকম কথাই লেখা আছে। বজ্রবিশাল আস্তে বললেও বজ্রের মত বিশাল শোনাল তার গলার আওয়াজ।

—তা হলে আলস্যঅভ্যাস সমিতির সেক্রেটারি, দক্ষিণায়ণ দীক্ষিত, আমি দক্ষিণ ব্র্যান্‌চ থেকে বলছি, যতদিন এ শহরে সত্যযুগ থাকবে ততদিন এখানে আমাদের তাঁবু তুলে দিয়ে স্টেডিয়াম বসায় এমন শক্তি কারও নেই।

দারা সিং-এর সঙ্গে দেখা করে পতিতপ্রাণ আর বজ্রবিশাল উত্তর আর দক্ষিণ ব্র্যান্‌চের কথা সব আলোচনা করল।

দারা সিং সব কথা শুনে বলল, মুখের কথায় লড়াই তো বেশিদিন চলতে পারে না, তাতে কাজ বেশি কিছু হবে না। দেখতে হবে কোন কায়দায় ওদের সারেন্‌ডার্‌ করানো যেতে পারে। আমি কি ভেবেছি জান, লড়াইটা আসলে উত্তরায়ণ রায় আর দক্ষিণায়ণ দীক্ষিতের বিরুদ্ধে আমাদের কজনের নয়, এটা হচ্ছে বুড়োদের বিরুদ্ধে ছেলেদের যুদ্ধ, গ্রেট ওয়ারের মত। খোঁজ নিলে দেখা যাবে আমাদের বুড়ো দাদু-দাদামশায়দের কারও কারও সঙ্গে এঁদের দুজনের বা কারও একজনের আলাপ থাকতে পারে। এই উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ণ—এদের বাড়ির ছেলেদেরও বোঝানো দরকার যে স্টেডিয়াম্‌ আমাদের কত বেশি দরকার। আর সেইজন্যই তাসদাবার বড় বড় ঘাঁটিগুলো আগে আমাদের হাতে আসা চাই। তখন দেখা যাবে দাদু-দাদামশাই আগে না স্টেডিয়াম্‌ আগে। উত্তর দক্ষিণে ছেলে পাঠিয়ে তোমরা যত জনকে পার জানিয়ে দাও, দাদামশাই আর দাদু—এরা আদর আবদার দিয়ে লোভ দেখাবার চেষ্টা করবে। লোভের ফাঁদে পা-দিলে চলবে না। স্টেডিয়াম্‌ আমাদের স্বাধীনতার লড়াই। স্টেডিয়াম্‌ আমাদের অর্জন করতেই হবে।

দারা সিং পতিতপ্রাণ আর বজ্রবিশালের কাজের রিপোর্ট গম্বুজকে দিয়ে তার নিজের প্ল্যানের কথাও সব খুলে বলল। গম্বুজ সব শুনে তারিফ করল। শুধু একটুখানি উপদেশ দিল, প্রথম দিকে অহিংসা নীতি মেনে চলতে হবে, তবে সুবিধে না-হলেই নীতি পালটে ফেলতে

হবে, অর্থাৎ তখন একমাত্র অস্ত্র—হিংসা। তবে বুদ্ধি খাটিয়ে ফাঁদে ফেলতে পারলে তো আর কথাই নেই!

দারাসিং বজ্রবিশাল আর পতিতপ্রাণের সঙ্গে আরও কাজের ছেলে জুটিয়ে দিল। কয়েকটা দিনের মধ্যেই উত্তরায়ণ রায় (জুনিয়র) আর দক্ষিণায়ণ দীক্ষিতের বাড়ি থেকে জনকয়েক ছেলেকে, তাদের নামধাম সুদ্ধ, পাকড়াও করা হল। যদিও এরা কেউ স্বর্ণস্যাঁকরাণী, দশ-মহাবিদ্যা বা রয়্যাল হাইনেস হাইস্কুলের ছাত্র নয়। তবে এসব স্কুলের সঙ্গে ম্যাচ্ খেলেছে। উত্তরায়ণের বড় মেয়ের মেজ আর সেজ ছেলে আর দীক্ষিতের ছেলের দুই ছেলে, অর্থাৎ দীক্ষিত-মাইনরের দুই ছেলে, গো-ডাউন মিড্ল স্কুল ও ফায়ার-ওয়ার্কস্ ইন্স্টিটিউসন্-এর ছাত্র।

এদের সবাইকে একদিন খাদ্যাখাদ্য ভোজনালয়ে চায়ের নিমন্ত্রণে ডাকা হল। খেলাধুলো নিয়ে অনেক দামি দামি কথার পর দারাসিং শেষকালে স্টেডিয়ামের কথায় এল। বলল, ম্যাচের সময় আমরা সবাই শত্রু, কিন্তু স্টেডিয়াম আমরা সবাই চাই, চাই কি না? শহরের চতুর্দিকে তাসদাবার ক্লাব রাতারাতি কত বেড়ে গেছে তার ঠিকানা মানে খবর আমরা কজন রাখি? দারাসিং গত কয়েক বছরে এই সব ক্লাবের সংখ্যা কত বেড়ে গেছে এবং তাদের নাম আর সেক্রেটারিদের নাম পর্যন্ত—সব কিছুর হিসেব দিল। আরও বলল, এদের মধ্যে জাঁদরেল দু-একটা ক্লাবকে ঢিট করতে পারলে আর সব ক্লাবগুলোকেও তাঁবু গোটাতে হবে। তাই আলস্যঅভ্যাস সমিতির মত একটা ক্লাবকে বাছাই করা হয়েছে।

উপস্থিত সবাই দারাসিং-এর কথাগুলো মন দিয়ে শুনল। খেতে খেতে মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করে দেখল। আর খাওয়া শেষ হলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, বুড়ো দাদু-দাদামশায়দের মিষ্টি কথায় ভুলে তারা এত বড় একটা কাজ ভেস্তে দেবে না।

একখানা ক্রিকেট ব্যাট, একজোড়া বুট, দুখানা ছবির বই, একটা ফাউন্টেন্ পেন বা একটা ক্যামেরা অথবা একটা বাইসিকল—এ রকম

কোন জিনিসের জন্যে স্টেডিয়ামের কথা একটি মুহূর্তের জন্যও তারা ভুলতে পারে না।

এই ভাবে আরও কয়েকবার উত্তরায়ণ রায় আর দক্ষিণায়ণ দীক্ষিতের বাড়ির ছোট ছেলেদের খাদ্যাখাদ্য ভোজনালয়ে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল। তারা বলল, স্টেডিয়ামের কথাটা কানাঘুঁষোয় গো-ডাউন মিড্‌ল স্কুল আর ফায়ার-ওয়ার্কস্‌ ইন্‌স্‌টিটিউসনের ছেলেদের অনেকেরই কানে গেছে। খাদ্যাখাদ্য ভোজনালয়ের স্পেশ্যাল ডিনারে সবাই উপস্থিত হয়েছিল। খাওয়া যেমন জমেছিল তেমনি জমেছিল জোর আলাপ।

দারাসিং মস্ত গলদা চিংড়ির ঠ্যাং এমন শব্দ করে চিবোল যে দীক্ষিত মাইনরের একজন ছেলে, যাকে ছেলের দলের বুড়ো বলা যেতে পারে, চমকে উঠেছে, যেন কোন বুড়োরই ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছে।

দারাসিং খুব মন দিয়ে ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বলল, শহরের সমস্ত বাড়িতে বাড়িতে যেদিন দাদু-দাদামশায়দের চিৎকার আর চেঁচামেচি শোনা যাবে, রাস্তাঘাটে তাদের শোভাযাত্রা বেরবে, সেদিন বুঝতে হবে স্টেডিয়াম্‌ আমাদের হাতের পাঁচ। ম্যাচ্‌ খেলার জন্যে আমাদের তাড়া খেয়ে খেয়ে এ মাঠ থেকে ও মাঠ, এ গলি থেকে ও গলি ঘুরে বেড়াতে হবে না। দেশে বিদেশে স্বাধীনতার লড়ায়ের পর বড় বড় বীরেদের কথা যেমন ইতিহাসে লেখা থাকে, সেইরকম রানী স্যাঁক্‌রাণী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়, হিজ রয়্যাল হাইনেস্‌ হাইস্কুল, দশমহাবিদ্যা পাঠশালা, গো-ডাউন্‌ মিড্‌ল স্কুল, ফায়ার্‌-ওয়ার্কস্‌ ইন্‌স্‌টিটিউসন্‌—এই সব স্কুলের নামও লেখা থাকবে স্টেডিয়ামের জন্য লড়ায়ের ইতিহাসে। ডিনার শেষ হয়ে গেলে ছেলেরা দারাসিং-এর কথায় খুব জোর পেল। বজ্রবিশাল আর পতিতপ্রাণ দারাসিং-এর কথাগুলো চটপট কাগজ পেন্‌সিলে লিখে নিল। ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটির ঘরে সদাসত্যবানের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

এই ভাবে দেখতে দেখতে কাজে নামার ক'টা দিনের মধ্যেই দারাসিং কাজ গুছিয়ে নিল। অগ্নিবাণ ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটির মেম্‌বার বাড়তে লাগল রোজ একটি দুটি করে।

পতিতপ্রাণ আর বজ্রবিশালের আত্মত্যাগের কথা অগ্নিবাণ ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে রটে গেল। তারা নিজেদের লেখাপড়া আর খেলাধুলোর কথা ভুলে গেল, ভুলে গেল তারা হিজ্‌ রয়্যাল হাইনেস্‌ স্কুল আর দশমহাবিদ্যা পাঠশালার ছাত্র। তারা ডিক্লেয়ার করল, অগ্নিবাণ ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটির কাজ তাদের একমাত্র কাজ।

পতিতপ্রাণ আর বজ্রবিশালের দেখাদেখি উত্তর আর দক্ষিণ কলকাতার বহু ছেলে দলে দলে ঘোষণা করল তারা মহৎ আদর্শের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে রাজী আছে।

পতিতপ্রাণ উত্তর দিকের এক আশ্চর্য খবর এনে শোনাল গম্বুজকে। একটি বার তের বছরের ছেলে তার একষট্টি বছরের দাদামশায়ের দাবার ছকের অশ্ব নৌকো আর গজ রাতারাতি এমন হাত সাফাই করেছে যে রাজা আর মন্ত্রীর সঙ্গে দাদামশাই নিজেও চোখে অন্ধকার দেখছেন! বহু জিনিসের লোভ তাকে দেখান হয়েছে, কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি। একেবারে শেষ সংবাদে জানা গেছে, সে দাদামশায়ের দামি দাবার ছকটাকেও সরিয়ে ফেলেছে। এই দাবার ছক নাকি দশঘড়ার তিনঘর জমিদার চাঁদা তুলে উপহার দিয়েছেন। ছেলেটির দাদামশাই এক ডজন ফুটবল, হাফডজন ক্রিকেট ব্যাট্‌, দেড় ডজন টেনিস র‍্যাকেট, এক গোছা হকিস্টিক্‌, দু ঝুড়ি টেনিস বল—এত সব কিছুর লোভ দেখিয়েছেন, যদি তাঁর দাবার ছক আর গুটি পাওয়া যায় তো সত্যিই দেবেন। কিন্তু নট্‌, নো দাবার ছক। তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, বাড়ির ভিতরে বাইরে খানাতল্লাসী চলেছে খুব জোর। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেটি সমানে ব'লে চলেছে—না। অগ্নিবাণ ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটি আসল খবর চেপে রেখেছে।

গম্বুজ বলল, কাজে নামলে কাজের লোক পাওয়া যায় না, আমি বিশ্বাস করি না।

দারাসিং সঙ্গে সঙ্গে বলল, না হলে আমাদের সোসাইটিতে এত ছেলে এল কোথা থেকে! সদাসত্য এই উৎসাহের খবর শুনে বলল,

কাজ হল ফুটবলের মত, মাঠে একবার গড়িয়ে দিন, ছেলের দল ছুটবে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে।

বজ্রবিশালের খবরও কম মজাদার আর চমকপ্রদ নয়।

গম্বুজ দারাসিং-এর কাছ থেকে খবর পেল কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের।

মাত্র বছর দশ এগার বয়সের একটি ছেলে তার ঠাকুরদার লেদার ব্যাগ থেকে এই নিয়ে প্রায় তিন জোড়া তাসের প্যাকেট সরিয়েছে। এর মধ্যে এক প্যাকেট্ বিশ পঁচিশ বছর আগে বাংলার এক গভর্নরের আর্দালির কাছ থেকে পাওয়া। আর এক প্যাকেট পাওয়া গেছে প্রাচীন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বৈঠকখানা থেকে। নানা হাত ঘুরে ছেলেটির ঠাকুরদার হাতে এসে পড়ে। এই এক জোড়া তাস তিনি কোহিনুর হীরের চেয়েও বেশি যত্ন করে রেখেছিলেন। এখন দু চোখে অন্ধকার দেখছেন।

আলস্যঅভ্যাস সমিতির দক্ষিণ ব্র্যান্চের তিনি একজন পুরনো মেম্বার। পাকা খেলোয়াড় হিসেবে যেমন তাঁর নাম, তেমনি নামডাক এই তাসজোড়ার জন্যে। ক্লাব আশা করছে খুব শীঘ্র তিনি এই তাস জোড়া ক্লাবকে দান করবেন। ক্লাবের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে, ঠিক তার আগে এই দুর্ঘটনা! রাগে দুঃখে বুড়ো ভদ্রলোকের চোখে জল এসে গেছে। অথচ কি করে উধাও হল তাসের প্যাকেটগুলো তা তাঁরও অজানা। ঘোর সন্দেহ হয়েছে এগার বছরের নাতির ওপর। অনেকগুলো প্রাইজ্ ডিক্লেয়ার করেছেন, কিন্তু সবই নিষ্ফল। বার্থ ডে-র জন্যে রিস্টওয়াচ্, ইন্ডিপেন্ডেন্স্ ডে-র জন্যে রাইফেল্, নিউ ইয়ার্স ডে-র জন্যে হট্ডগ্স, দুর্গা পূজোয় বিগ্ ড্রাম, সরস্বতী পূজোয় একশো টাকা চাঁদা, ক্রিকেটের সিজন টিকিট—তবে একটি মাত্র সর্তে, এই এক জোড়া তাসের খোঁজ চাই। লেদার ব্যাগ থেকে কি করে উধাও হল তাস জোড়া তা তাঁর মাথায় ঢুকছে না।

অগ্নিবাণ ওয়েল্ফেয়ার্ সোসাইটির তেকোণা অফিস ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ রইল গুপ্ত সংবাদ।

এই সব ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই ঘটল আরও অনেক কিছু, যেমনি মজাদার তেমনি ঘোরালো। এক একটা পরিবারের মধ্যে ছেলে বুড়োয় লড়াই বাধল আর শুরু হল রীতিমত রেষারেষি। উত্তর থেকে দক্ষিণে আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছোটাছুটি শুরু করে দিল অগ্নিবাণ ওয়েল-ফেয়ার সোসাইটির মেম্বাররা। আর ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটির গোপন বুলেটিনে এই রকম সব খবর একটার পর একটা ছেপে বেরুতে লাগল।

ক্লাবের মেম্বারদের পঞ্চাশবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে কি রকম কাপ ডিসে চা বা কফি পান করতে দেওয়া হবে সেই জন্যে একেবারে নতুন ডিজাইনের কাপ ডিসের খোঁজে বেরিয়েছিলেন উত্তরায়ণ রায়। তিনি চৌরঙ্গী অঞ্চলের একটা বড় দোকানে ঢুকেছিলেন। তাঁর বড় মেয়ের অনেক দিনের ইচ্ছে একেবারে নতুন ডিজাইনের একটা টি-সেট পছন্দমত দেখেশুনে কিনবেন। সেইজন্যে রায়মশাই মেয়েকে তার শ্বশুর বাড়ির গাড়িতে সোজাসুজি একেবারে ওই দোকানের সামনে চলে আসতে বলেন।

তিনি মেয়ের জন্যে পছন্দমত একটা টি-সেট সত্যিই পছন্দ করে রেখেছেন। কিন্তু কই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির গাড়ির তো কোন পাত্তা নেই। তিনি নিজেও জামাই-এর গাড়িটা এসে গেলে খুচ-খাচ দু চারটে কাজ এদিক ওদিক সেরে নেবেন। তাঁর নিজের গাড়ি চালাবার লোক নেই। ড্রাইভার, পুরনো বিশ্বাসী লোক হয়েও অবিশ্বাসের কাজ করেছে। ছেলেকে কারখানায় ভর্তি করে দিতে যাচ্ছে বলে মেয়ের বিয়ের জন্যে পাত্র খুঁজতে গেছে।

এমনি সময় সত্যিসত্যিই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির গাড়ীর বদলে এসে দাঁড়াল এক অল্পবয়সী ছোকরা। তার হাতে তাঁর মেয়ের লেখা একটুকরো চিঠি। তাঁর মেয়ে লিখেছে, বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আসতে পারছে না। কেনা জিনিস যেন এই ছেলেটার হাতে দিয়ে দেন। সঙ্গে গাড়ি গেল। যদি দরকার হয় তো দরকারী কাজ সেরে নিতে পারেন।

ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন সে নতুন কাজে লেগেছে। নাম গজদন্ত। ছেলেটার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে

উত্তরায়ণ বললেন, গজদন্ত, গাড়িতে এই সব জিনিস পত্তর গুলো তুলতে হবে। তুমি এগোও, আমি দাম চুকিয়ে যাচ্ছি।

গজদন্ত যখন কাচের কাপডিসগুলোর বাক্সটাকে সযত্নে ঘাড়ে তুলেছে, তখন উত্তরায়ণ দেখলেন চোখে কালো ঠুলি, গোঁফদাড়ি ভরা একখানা মুখ তার সঙ্গে দু-চার কথা কি বলল যেন। উত্তরায়ণের মনে হল একবার, এ মুখ আগে তিনি কোথাও দেখে থাকবেন! কিন্তু মনে করতে পারলেন না কিছুতেই।

গজদন্তকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে রে লোকটা?

গজদন্ত দাঁত বার করে হেসে বলল, নতুন ড্রাইভার।

উত্তরায়ণ রায় মনে মনে ভাবলেন, হবেও বা, মেয়ের বাড়ির চাকরের মত গাড়ির ড্রাইভারও বদল হয়েছে।

গাড়িতে এসে উঠলেন রায়মশাই। বললেন, আমায় ক্লাবের দরজার গোড়ায় নামিয়ে দিয়ে তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পার। অনন্ত-শায়িনীকে বলো, আমার মেয়েকে আর কি, ওর পছন্দমতই আমি কিনেছি। ক্লাবের ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। খুব শিগ্‌গির দেখা করতে যাব ওদের সঙ্গে। নাতিদের খবর কি?

গলার স্বরও চেনা মনে হল উত্তরায়ণের। কিন্তু কোথায় শুনেছেন মনে করতে পারলেন না।

—আচ্ছা বাবা, তুমি সোজা চল তো এখন, কালীঘাট পেরবার পর আমায় ব'ল, আমি তোমায় সর্ট্‌-কাট দেখিয়ে দেব, এই বলে উত্তরায়ণ গাড়ির পিছনের সিটে হেলান দেওয়ার মত করে গড়িয়ে পড়লেন।

কালীঘাট আসার অপেক্ষায় ঘুমের চেষ্টা করছিলেন রায়মশায়! সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি, গাড়ি পক্ষীরাজ ঘোড়ার বেগে ছুটছিল তখন।

ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখলেন গাড়ির একখানা চাকাও নড়ছে না। মাছি বা মশার চক্করের মতও কোন শব্দ হচ্ছে না। স্টীয়ারিং-এর ওপর মাথা রেখে কালো চশমা পরা ড্রাইভার ঘুমচ্ছে।

—কী হে, কালীঘাট ছাড়িয়ে না কি?

—আজ্ঞে অনেকক্ষণ, ড্রাইভার মাথা তুলে বলল !

—তুমি ঘুমচ্ছিলে না জেগেছিলে হে ? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন উত্তরায়ণ।

—আজ্ঞে দুসেকেণ্ড করে ঘুমিয়ে এক সেকেন্ড করে জেগেছি, কালোচশমা আঁটা ড্রাইভার দেরি না করে উত্তর দিল।

—তা আমাকে ডাকলে না কেন ?

—আজ্ঞে এক নম্বর আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, দু নম্বর, তাই দেখে আমি নিজেই সর্টকাট্ করার চেস্টা করেছিলাম।

—তা এখানে এলেই বা কোথায়, গাড়িই বা থেমে আছে কেন ?

—আজ্ঞে, আপাতত আছি মহিষাসুর বধ এ্যাভেনিউতে। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে। গজদন্ত গেছে পেট্রোকেরোসিনের খোঁজে।

—থাম থাম, একটু আস্তে সুস্থে বল। মহিষাসুর বধ না হয় বুঝলুম, কিন্তু এটা কোন সুবাদে এ্যাভেনিউ, আর এর মধ্যে গাড়ি ঢোকালেই বা কি করে ?

—আজ্ঞে শুধু সর্টকাট করব এই জেদে। আর নামের কথা বলছেন, মানুষের চেহারার মিল নেই, সে রকম রাস্তার নামের সঙ্গে রাস্তারও। নেপলিয়ন মাথায় ছোট ছিলেন, বিশ্বসুদ্ধ লোকে শুধু ছোট্ট নেপলিয়ন বললেই বুঝত। কিন্তু নেপলিয়নের চেয়েও মাথায় ছোট এমন কোন একজন লোকের নাম থেকে একটি শব্দও বাদ দেবার উপায় নেই। নামটা হয় তো আপনি শুনেও থাকবেন, মহার্ণব জ্ঞানপুষ্করিণী বিদ্যাবাচস্পতি বাগীশ।

—আচ্ছা, এও নয় বুঝলাম। কিন্তু পেট্রোকেরোসিন বস্তুটি কি ?

—আজ্ঞে আজকাল সব কিছুতেই আসলের জায়গায় নকল দিয়ে চালান হচ্ছে। তাই পেট্রলের অভাবে পেট্রোকেরোসিনের ব্যবহার। গজদন্ত কাছাকাছি মনোহারী দোকানে খোঁজ করতে গেছে। এক আধকিলো পেলেও কাজ চলে যাবে। তবে এ রকম ব্যবস্থায়, হাওয়াগাড়ি হাওয়ার মত যাবে না। মোটর চলবে সাইক্লের স্পীডে। পেট্রোকেরোসিন সর্ষের তেলের মত কিলো হিসেবে বিক্রি হয়।

—গরুর গাড়ির স্পীডে চললেও বাঁচি, তা কতক্ষণ থাকতে হবে এ অন্ধকূপে ?

—গজদন্ত না ফিরলে তো বলা মুশকিল।

এমনি সময় গজদন্ত ফিরল। বলল, দোকানদার বলেছে যে-কয়কিলো ছিল তা খরিদ্দারে কিলিয়ে শেষ করেছে। আর বাকি এক আধকিলো পাবে জানাশুনো খদ্দেরে।

উত্তরায়ণ বুঝলেন, অতএব কোন চান্‌স নেই।

—আমাকে গলি পার করে একটা ট্যাক্‌সি ডেকে দে বাবা দন্ত, গজদন্তকে বললেন উত্তরায়ণ। তারপর কি ভেবে বললেন ড্রাইভারকে, জিনিসপত্তরগুলো মেয়ের বাড়িতেই পৌঁছে দিও। আমার তো এখন আর ক্লাবে গিয়ে কোন লাভ নেই, হাতঘড়ির দিকে তাকালেন।

মহিষাসুরবধ এ্যাভেনিউ পেরিয়ে যখন বড় রাস্তায় এসে পা দিলেন, তখন গজদন্তকে না বলে পারলেন না উত্তরায়ণ, সর্টকাট কাকে বলে কান ধরে দেখালে বাছা!

গজদন্ত একটা ট্যাক্‌সি ডেকে উত্তরায়ণকে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ডানহাতে যখন ট্যাক্‌সির দরজা বন্ধ করছে বাঁ-হাতের পিছনে আড়াল করেছিল রায়মশায়ের চামড়ার ব্যাগ।

সারাক্ষণই ব্যাগ তাঁর হাতে হাতে ছিল। ঠিক ট্যাক্‌সির দরজা দিয়ে মাথা গলাবার মুহূর্তে হাত বাড়িয়েছে গজদন্ত, একহাতে ট্যাকসির খোলা দরজা ধরে রেখে। কখন অন্যমনস্কে হাতছাড়া করেছেন ব্যাগটা খেয়াল ছিল না।

ট্যাক্‌সি বড় রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল ব্যাগটা তো কই গজদন্তর হাত থেকে নেওয়া হল না। ব্যাগের মধ্যে আলস্যঅভ্যাস সমিতির দরকারী ফাইল, কাগজ পত্র! মহিষাসুর বধ এ্যাভেনিউ-এর মোড়ে ট্যাক্‌সি ফিরিয়ে যখন গজদন্ত প্লাস হাত-ব্যাগ দুয়ের খোঁজ করতে এলেন, দেখলেন এ্যাভেনিউ-এর মোড়ে বিকেল পাঁচটার মধ্যেই চোখ-গেলে দেওয়া অন্ধকার, ভুতুড়ে আর গা-ছম ছম করা।

ট্যাক্‌সি নিয়ে মহিষাসুরবধ এ্যাভেনিউ-এর গলিতে একা ঢুকতে তাঁর সাহস হল না। তাছাড়া সর্টকাটের এই গলি ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজল্‌-ধাঁধার চেয়েও গোলমেলে পথ। বেরুবার পথ শুধু তিনি দেখেছেন। ঢোকবার পথ তাঁর চোখে পড়েনি। কারণ তিনি ঘুমচ্ছিলেন। চোখ খোলা থাকলে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভারকে আর এই এ্যাভেনিউতে ঢুকতে হ'ত না।

উত্তরায়ণ ভাবলেন মেয়ের বাড়ীতে একটা ফোন করে রাখা ভাল। ফোনে বলে রাখা যে তাঁর দরকারী কাগজপত্তরের চামড়ার ব্যাগটা বোধ হয় গাড়ীতেই ফেলে এসেছেন।

ফোন করতেই ওদিক থেকে সাড়া এল। তাঁর মেয়ে অনন্তশায়িনী কথা বলছে।

সব কথা আগাগোড়া খুলে বললেন উত্তরায়ণ। ওদিক থেকে কিছুক্ষণ সাড়াশব্দটি নেই, অনন্তশায়িনী ফোন ছেড়ে দিলেন নাকি ?

না, তিনি তাঁর বাবার একটি কথাও বুঝতে পারেননি। সে কারণে গাছ থেকে পড়েছেন। তিনি শুধু হাঁপাতে হাঁপাতে জানালেন, তিনি গাড়ি পাঠাননি, চাকর বা ড্রাইভার বদল করেননি।

উত্তরায়ণ রায় জেরা করলেন, কিন্তু গাড়ির রং আর চেহারা এও কি ভুল দেখেছি ?

মেয়ে জবাব দিয়েছেন, দুটো কাক যদি এক রকমের হতে পারে দুটো গাড়ি কি এক রকমের দেখা যায় না, বাবা ?

কী বলবেন জবাবে আর, কথা খুঁজে পান না রায়মশাই।

দু দিন থেকে চারদিন, এই ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে আট থেকে ষোল দিন পার হয়ে গেল, শত্রুপক্ষের ষোলকলা পূর্ণ হল। উত্তরায়ণ না পেলেন ক্লাবের ফাইলপত্তর, না পেলেন কেনা জিনিসপত্তর। লজ্জায় দুঃখে রাগে চেপে রাখলেন অপমানের জ্বালা আর যন্ত্রণা। অনেক কথা এদিক ওদিক থেকে শুনলেন কানাঘুষোয়। দোষ যে দেবেন, শাস্তির ব্যবস্থা করবেন, তা ধরবেন কাকে।

এদিকে শত্রুপক্ষের পরাজয়ে বিজয়ী শিবিরে যেমন সোরগোল

কলরব পড়ে উৎসবের আনন্দ উল্লাসে, তেমনি হৈ-রৈ পড়ে গেল অগ্নিবাণ ওয়েল-ফেয়ার সোসাইটির অফিস ঘরে। বজ্রবিশালের মোটর ড্রাইভিং-এর লাইসেন্স আছে শোনা যায়, কিন্তু মোটর ড্রাইভারের পার্ট সে এত ভাল করবে কে জানত! দারাসিং-এর মুখ থেকে প্রশংসার কথা গম্বুজের মুখে, আর গম্বুজের মুখ থেকে অগ্নিবাণের মুখে ঘুরতে লাগল।

সদাসত্য এই সব শুনে অগ্নিবাণকে বলল, কর্তা তিন নম্বরের কাজটা ব্যাঘ্রবিলাসকে দিয়ে দেন।

সদাসত্যবান বজ্রবিশালকে ব্যাঘ্রবিলাস নামে ডাকায় ঘরসুদ্ধ সবাই হো হো করে হেসে উঠল। গজদন্ত হচ্ছে উত্তরায়ণের মেয়ে অনন্তশায়িনীর মেজ আর সেজ ছেলের আবিষ্কার। গজদন্তের আসল নাম গজানন্দ ভেঙ্কটেস্। বাঙ্গালী না-হলেও ফর্‌ফর্ করে বাংলা বলে। গো-ডাউন মিড্‌ল স্কুলের ছাত্র সে।

সমস্ত ব্যাপারটা উত্তরায়ণের মেয়ের দুই ছেলে খোঁজ খবর নিয়ে গোড়া থেকে সাজিয়েছে। অনন্তশায়িনীর হাতের লেখা নকল করেছে মেজ ছেলে। গাড়ির ব্যবস্থা করেছে দারাসিং এক মোটর গাড়ির কারখানা থেকে। সেই কারখানার বড় বড় দুজন মিস্ত্রিকে বড় ডাক্তার দেখিয়ে চশমা ঠিক করে দেবে এই সর্তে। আর মহিষাসুর বধ এ্যাভেনিউ-এর খোঁজ দিয়েছে এরাই। পুরনো গাড়ি মেরামত করার পর এই রাস্তা দিয়ে চালিয়ে তারা পরীক্ষা করে দেখে গাড়ি মজবুত হয়েছে কিনা। এই রাস্তায় যে গাড়ি এক মুখ দিয়ে ঢুকে আরেক মুখ দিয়ে বেরুতে পারে, সেই গাড়ি সম্পর্কে আর গ্যারান্টির দরকার হয় না।

গজানন্দ ভেঙ্কটেস ভারি চালাকি করেছে। ঠিক যে-মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে ট্যাক্‌সিতে উঠতে যাচ্ছেন রায়মশায়, সেই মুহূর্তে তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়েছে গজদন্ত। খেয়াল করতে পারেননি উত্তরায়ণ রায়, ব্যাগ তাঁর হাতে আছে না গজদন্ত সময় বুঝে হাতসাফাই করেছে।

আলস্য অভ্যাস সমিতির পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসের মাথায় বজ্রবিশাল বুঝি রাতারাতি বজ্রাঘাত করেছে।

খবর চাপা থাকে না। দক্ষিণায়ণ দীক্ষিতের দুরবস্থার কথাও জানাজানি হল। দীক্ষিত মাইনরকে ক্লাবের মেম্বাররা ধরলেন ক্লাবের সামনের উৎসব উপলক্ষে পোলাও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে।

মেম্বাররা সংখ্যায় কম নন। তা ছাড়া চার পাঁচজন মেম্বার এই বুড়ো বয়সেও যা খান তাতে বাদ বাকির কম পড়ে যেতে পারে। কোথায় পাবেন এ বাজারে পোলাও-এর এত চাল !

শেষকালে মনে পড়ল বড়বাজারের বিখ্যাত চোরাকারবারী রামভকত্ হনুমানমূর্তির কথা। রামভকত্ মূর্তিমান হনুমানই বটে। চাপা গলায় খুব আস্তে কথা বলে। যেটুকু দরকার তার চেয়ে এতটুকু বেশি বা কম নয়! সামান্য কিছু চাল আছে। কিছু খদ্দের চড়া দামে কিনতে চায়। কিন্তু রামভকত্ নামী লোককে দিতে চায়। দীক্ষিত মাইনরকে সে দেবে সামান্য লাভ রেখে। তবে হ্যাঁ, হনুমানমূর্তির বুড়ো চাচাকে ক্লাবের মেম্বার করে নিতে হবে। চাচা খেলতে জানে না, তবে মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে যাবে টিপ সই মেরে। ক্লাবের মেম্বার না হলে লোকে নাকি ভোদ্দর লোক বলবে না। দক্ষিণায়ণ বললেন, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তবে ক্লাবের নিয়ম হচ্ছে শুধু খেলোয়াড় নয়, ভাল খেলোয়াড় হলে তবে সভ্য হওয়া যাবে। হনুমানমূর্তি বলল ঠিক সময়ের একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু সে অন্য খদ্দেরদের পাল্লায় পড়ে যাবে। কারণ সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যতোক্ষণ দোকান খোলা থাকে তার মধ্যে বারজন খদ্দেরের টাইম কখন কখন তা কাগজে হিন্দিতে লিখে দিল। এই সব টাইম বাদ দিয়ে দুপুর বিকেলের মাঝামাঝি ফাঁকা ফাঁকা একটা সময় দিল।

দীক্ষিত বললেন, তিনি তাঁর বাবার আমলের বিশ্বাসী পুরনো গাড়োয়ানকে দু-ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আসতে বলবেন। গাড়ির চারিদিক ঢাকা। চালের বস্তা কারও নজরে আসতেই পারে না।

দীক্ষিত বুড়ো গাড়োয়ান আন্জাম্ বদ্‌রুদ্দীন্‌কে দু-ঘোড়ার গাড়ি

নিয়ে দুপুর বিকেলের মাঝামাঝি সময়ে হনুমানমূর্তির দোকানে উপস্থিত হতে বললেন।

কিন্তু নিতান্ত অবাক কাণ্ড! নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে। তানজাম্ বদরুদ্দীন গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়নি।

হনুমানমূর্তি ঘড়ি ধরে বসেছিল। আর মাঝে মাঝে নিজেই নিজের নাড়ি টিপছিল, বুকের ঢিপ ঢিপ পরীক্ষা করছিল। পঁচিশ সেকেন্ড বেশি অপেক্ষা করেছে। তারপরই ফোন করেছে দীক্ষিত মাইনরকে। শুনে বিস্মিত হয়েছেন দক্ষিণায়ণ। ফোনে মুখ রেখে শুধু বলেছেন, কী, কী, কী বলছেন আপনি? ওপাশ থেকে হনুমান ঘড়ঘড়ে গলায় বলেছে, আপকা তানজাম কা কাম হারাম হ্যায়।

সারাদিনের মধ্যে বদরুদ্দীনের দেখা পাওয়া গেলনা। খোঁজ খবর করে দু-ঘোড়ার গাড়ির পাত্তা মিলল না।

শেষকালে রাত বারোটায় তানজাম এল। একটা ঘোড়া আর গাড়ি নিয়ে প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে চোখ মুছতে মুছতে এসে হাজির হল তানজাম্ বদরুদ্দীন।

তানজামের মুখের কথামত, দীক্ষিত জানতে পারলেন, গাড়ি যখন এম. বি. এ্যাভেনিউ দিয়ে চলছিল তখন সরু রাস্তার মধ্যে ভয় পেয়ে হোঁচট খেয়ে পা হড়কে পড়ে যায় একটা ঘোড়া। তারপর তাকে সেখান থেকে আর নড়ান যায়নি। বলতে বলতে বুড়ো বদরুদ্দীনের দু-চোখের পাতা জলে সপ্ সপ্ করতে লাগল।

পরদিন যখন ঘোড়ার জন্যে তানজামের সঙ্গে লোকজন পাঠালেন, দক্ষিণায়ণ জানতে পারলেন মহিষাসুর বধ এ্যাভেনিউতে এই হাঙ্গামা ঘটেছে!

দক্ষিণায়ণ প্রশ্ন করায় তানজাম্ বলেছে, একটি ছেলে তাকে এই পথ দেখিয়ে বলেছিল রাস্তাটা পার হলেই ওপারে বড় বাজার। বড়বাজার বলতে ছেলেটা কী বুঝেছে সেই জানে।

আসলে মাথা নাড়লেও যথার্থ কাজের দিন বদরুদ্দীন বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। দীক্ষিত মাইনরের দুই ছেলে এ সব কিছুর মূলে।

তারা বুড়ো গাড়োয়ানের মাথা বিগড়ে দিয়েছে। আর তাদের মাথায় বুদ্ধি জুগিয়েছে পোটেটোপ্যান্ সিংরে। দীক্ষিতের দুই ছেলে বাড়িতে গুপ্তচরের কাজ করেছে। পতিতপ্রাণ প্ল্যান যেমন ছকে দিয়েছিল সেই মত কাজ হয়েছিল।

এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যে পুরস্কার তাকে দেওয়া হবে অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি থেকে তা মন্দ কি! পঁচিশ টাকা ভাতা পাবে সে প্রতি মাসে, যতদিন বাঁচবে তান্‌জাম্ ততদিন। এ ছাড়া ভাল ফ্যাক্টরির বিড়ি পাবে, অগ্নিবাণ ব্রহ্মের পুরনো জুতো জামাও পাবে। এ জন্যে আর সব লোকের মত তাকে নাম লিখিয়ে কার্ড করাতে হবে না।

দু ঘোড়ার গাড়িটাকে কোনরকমে একবার যদি মহিষাসুর বধ এ্যাভেনিউয়ের গলিটাতে ঢোকান যায় তা হলে আর কোন চিন্তাই নেই। আর এ কাজে হুঁসিয়ার পাকা গাড়োয়ান যে-রকম খেলা দেখাবে তা কি আনাড়িকে দিয়ে হয়? ঘোড়া জখম হবে না অথচ গাড়ি ঢুকবে, একটা ঘোড়া বিগড়ে গিয়ে ধরাশায়ী হবে যখন, আরেকটা ঘোড়া একা গাড়ি টানতে চাইবে না।

ক্লাবের অতজন হোমরা চোমরা সভ্যদের কাছে এই ভাবে মান ডোবাবেন ভাবতে পারেন নি দীক্ষিত। এত বড় পরাজয়ের পর আর কি তিনি মাথা তুলতে পারবেন!

কিছুদিনের মধ্যেই সংবাদ ভাণ্ডারে বিবিধ সংবাদের কলমে খবর পাওয়া গেল, শহরের নানা প্রান্ত হইতে, বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণ, ছেলেবুড়োর ঘোর অসদ্ভাবের সংবাদ কানে আসিতেছে। নানা পরিবারে ছেলেবুড়োর বনিবনার অভাবের কথা নিত্য শোনা যাইতেছে। বিশ্বস্তসূত্রে আরও জানা গিয়াছে, ছেলের পাল ও বৃদ্ধের দল ভিন্ন দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। নাবালকের উৎপাতে ও ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হইয়া তাসাদাবার বহু পুরনো প্রতিষ্ঠান শহর পরিত্যাগ করিয়া শহরতলীর দিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

কলকাতা শহরে লাইব্রেরি আছে অনেক। বেরিবেরিতে আক্রান্ত লোকের মত পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরি। তবে জঁাদরেল বলতে যে কটা আছে, তাদের নামের লিস্ট প্রায় তৈরি করে ফেলেছে নরাধম। বিদ্যাসমবায় সমিতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের যৌথ খামার, মহাপৃথিবীর জ্ঞান-মৌচাক, সর্ববিদ্যাসংগ্রহশালা, বিশ্ববিদ্যাপীঠস্থান, ক্যাস্‌ল অফ আপ্‌-টু-ডেট্‌ নলেজ, প্রিজ্‌ন-হাউস অফ ওল্‌ড আইডিয়াজ্‌, ম্যান্‌সন্‌ অফ মডার্ন থট্‌স—এই রকম নামজাদা কিছু লাইব্রেরিতে হানা দেওয়ার কথাই আগাগোড়া ভেবেছে নরাধম।

নরাধম স্বর্ণস্যাঁকরাণী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়, হিজ রয়্যাল হাইনেস হাইস্কুল, দশমহাবিদ্যা পাঠশালা, গো-ডাউন মিড্‌ল স্কুল আর ফায়ার ওয়ার্কস্‌ ইন্‌স্টিটিউসন্‌ এই সব স্কুলের ছাত্রদের ক্লাসে ক্লাসে হ্যাণ্ডবিল বিলি করে দিয়ে এল! সেই সব হ্যাণ্ডবিলে ছাপা ছিল—

দাঁত ভাঙ্গা যতো বই
পড়লেই ওঠে হাই
যদি কর হৈ-চৈ
পুড়ে ওরা হবে ছাই।
এস ভাই লেগে যাই
প্রাণপণে লড়ি সব—
কানফাটা কলরব
দাঁতভাঙা বই নাই।
এস ছুটে কাঁচি নাও
যতো পাতা কেটে দাও
দাঁতভাঙা বই ভাই
থাকবে না কোথাও॥

এরপর নরাধমের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেশ কিছু ছেলে উৎসাহী হয়ে উঠল। তারা ব্যাপারটা আন্দাজ করেছে, কিন্তু আরও পরিষ্কার বুঝতে পারলে তাদের পক্ষে কাজে নামার সুবিধে হয়। নরাধম বলল,

আগে দেখতে হবে সত্যি সত্যিই ছেলেরা এই সব বই পছন্দ করে কিনা, যেমন—লঙ্কায় অঙ্কের ঝাল, স্পুটনিকে বিশ্ব পরিভ্রমণ ইত্যাদি। উপস্থিত ছেলেরা সবাই হাত তুলল, বলল, তারা বিশ্বাস করে এ বই ছেড়ে তারা কেন—কোন ছেলেই মামার বাড়ি, চিড়িয়াখানা বা পিক্‌নিকে যেতে চাইবে না।

নরাধম এ কথা শুনে বলল, এর পরের কথা হচ্ছে এ কাজের জন্যে লড়তে হলে সবচেয়ে দরকার হল হাতের ওস্তাদি কাজ।

সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নরাধমের মনে হল হাতের কাজ বলতে কী বোঝায় কেউ ঠিক ধরতে পারছে না।

নরাধম মাতব্বরের মত হাসল, তারপর বলল, আমরা সোজা কথায় যাকে বলি হাত সাফায়ের ওস্তাদি।

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসল অর্থাৎ বেশ মজার কথা।

নরাধম বলল, এই যে আমরা পথেঘাটে মারকাট যত সব পকেটমার দেখি, এদের মত কিছু চালাকচতুর চোখকান খোলা হুঁসিয়ার ছেলে। মানে যার পকেটমারা যাবে সে বুঝতে পারবে না তার জামার পকেট ছিল কি না কোনদিন।

ফায়ারওয়ার্কস ইন্‌স্‌টিটিউসনের একজন ছেলে বলল, আমাদের স্কুলের দুজন ছেলেকে আমি জানি তারা হাত সাফায়ের ব্যাপারে ওস্তাদ। একজন বাজী রেখে স্কুলের ছেলেদের পকেটমেরে সারা বছরে পেয়েছিল এগার ডজন রুমাল, দেড়শ সিকি, তিনশো পঞ্চাশ কিলোগ্রাম চিনে-বাদাম, একত্রিশটা পুরনো আর নতুন ফাউন্‌টেন্ পেন, প্রায় সাড়ে চার কি পাঁচ ডজন রংচটা পেনসিল, ক্রিকেট আর ফুটবল খেলোয়াড়দের হাজার গণ্ডা ছবি। আরেকজন ছেলে চ্যালেন্‌জ করে দু বছরে বার জন মাস্‌টারের পকেট মেরেছিল; শেষকালে হেড্‌মাস্‌টারের পকেট যেদিন মারা গেল সেদিন তো হৈ রৈ ব্যাপার। পরের দিনই হেড্‌মাস্‌টার টাকা ফেরত পেলেন। ছেলেটাকে আর মাইনে দিয়ে পড়তে হয় না। বার জন মাস্‌টারও টাকা ফেরত পেয়েছেন। তবে কেউ আর তাকে ফেল করাতে পারবেন না পরীক্ষায়।

নরাধম তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলে ছেলেটি বলল, প্রথম জনের নাম কর্মযোগী যোগীন্দর সিং আর দ্বিতীয় জনের নাম হাতযশ খাস্তগীর।

নরাধম তাড়াতাড়ি তাদের নাম নিজের নোটবুকে লিখে নিল।

দশমহাবিদ্যা পাঠশালার একজন ছাত্র বলল, তাদের পাঠশালার একজন ছেলের এই হাত সাফায়ের বিদ্যা ভাল জানা আছে। সে একবার গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটিতে রাজাবাজারের একজন নামকরা পকেটমারের কাছে পুরো একটি মাস শখের ট্রেনিং নিয়েছিল। বইয়ের পাতা খুলে নেওয়া তো হাতের পাঁচ, সে যদি পায়রার পালক ছাড়িয়ে নেয় তো পায়রাটা বুঝতেই পারবে না, টেরই পাবে না। একবার সে বাজী ফেলে স্কুল ইন্‌সপেক্টরের মাথার টুপি ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিল। তিনি বুঝতেই পারেন নি মাথার টুপি মাথায় নেই! ইন্‌সপেক্টর ইচ্ছে করে শক্ত শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। তাই এ রকম শাস্তি। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না মাথার টুপি। শেষকালে আবার এক সময় দেখা গেল মাথার টুপি মাথায় আছে।

নরাধম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেটার নাম জিজ্ঞাসা করল। দশ-মহাবিদ্যা পাঠশালার ছাত্র বলল, চতুর্ভুজ ত্রিপাঠি। অনেকে বলে ওর আরও দুটো লুকানো হাত আছে, যেমন সেকালের ডাকাতের রণ-পা থাকত।

চতুর্ভুজ ত্রিপাঠির নামও নরাধম লিখে নিল। পরে বলল, এদের তিন জনকে চটপট আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে ভাই।

কর্মযোগী যোগীন্দর সিং, হাতযশ খাস্তগীর আর চতুর্ভুজ ত্রিপাঠি তিন জনে অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ঘরে নরাধমের সঙ্গে দেখা করল।

নরাধম ছেলেদের ওপর লাইব্রেরিগুলোর অত্যাচারের কথা খুলে বলল ভাল করে। নরাধম বলতে বলতে বক্তার মেজাজে বলে ফেলে, ভাই সব (যদিও ঘরে শুধু কর্মযোগী, খাস্তগীর ও ত্রিপাঠি তিনজনে ছিল) হ্যাণ্ডবিলের কথা নিশ্চয় মনে আছে সকলের—

এস ছুটে কাঁচি নাও
যতো পাতা ছেঁটে দাও
দাঁত ভাঙা ঝুটো বই
থাকবে না কোথাও

যত ছেলেকে পার এই সব লাইব্রেরির মেম্বার করে দাও। তাদের হাতে হাতে টাকা দাও, তারা লাইব্রেরিকে দান করবে। তাদের জোর বাড়লে তারা লাইব্রেরি থেকে বেশি বই আনতে পারবে। তখন বই পড়ার চেয়ে বই হারানো আর বই সরানো অথবা পাতা পোড়ানোর কাজই হবে বেশি দরকারী।

নরাধম নামজাদা লাইব্রেরিগুলোর নাম বলে গেল একটা একটা করে। আরও বলল, সর্ববিদ্যা সংগ্রহশালা আর প্রিজ্‌ন হাউস অফ ওল্‌ড আইডিয়াজ—এই দুটো লাইব্রেরিকে কাবু করাই হবে কঠিন কাজ। কারণ যত বুড়ো হচ্ছে এই সব লাইব্রেরির লাইফ-মেম্বার অর্থাৎ সারা জীবনের মত সভ্য। যতো বুড়োটে বই এই দুটো লাইব্রেরিতে ঠাসা। এই দুটো লাইব্রেরি থেকে তর্করত্ন, তর্কবাগীশ, তর্কালঙ্কার, ন্যায়রত্ন, বাচস্পতি, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যাবাগীশ মহা-মহোপাধ্যায় এই সব নামের রাইটারদের বই একধার থেকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। তোমারা দুজনে, মানে খাস্তগীর আর ত্রিপাঠি, এ কাজের দায়িত্ব নাও। বিভিন্ন স্কুলের ছেলেদের ট্রেনিং দিয়ে কাজ শিখিয়ে তোমাদের কাজ হাসিল করতে হবে। টাকার জন্যে ভেব না, অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ফান্‌ড থেকে ব্যবস্থা করা হবে। আমি গম্বুজ চৌধুরির সঙ্গে দেখা করছি খুব শীগ্‌গির।

তারপর কর্মযোগীকে বলল, তোমার কাজ একটু অন্য ধরনের। যতদূর জানি জ্ঞানবিজ্ঞানের যৌথখামার, ক্যাস্‌ল অফ আপ্‌ টু ডেট নলেজ, ম্যান্‌সন্‌ অফ মডার্ণ থট্‌স এই সব লাইব্রেরিগুলোতে আমাদের চাহিদামত বই যথেষ্ট আছে। এই সব জায়গায় তোমার আর তোমার দলের লোকেদের কাজ হবে আরও বেশি বেশি এই সব বই লাইব্রেরি-গুলোর তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া। একটু হুঁসিয়ার হয়ে চালাকের মত

কাজকর্ম করতে পারলে এই সব লাইব্রেরির সমস্ত বই হবে আমাদের। দরকার হলে বই দান করতে হবে, উপহার দিতে হবে, যেমন নাকি বিদেশ থেকে আমাদের শিশুদের জন্যে ফ্রি দুধ আসে বিলি করার জন্যে, সেই রকম আমাদের পছন্দমত বই বিলি করতে হবে।

যোগীন্দর বাঙালী না-হয়েও চমৎকার বাংলা বলে, সে খুব উৎসাহ পেল কাজে। বলল, যদি কম করে পঞ্চাশ জন ছেলেও রবিবার বাদে প্রতিদিন ঘণ্টায় পঁচিশখানা করে পাতা তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে কাটে তো তিরিশ দিনে কখানা পাতা কাটা হবে!

তার হিসেব করার কায়দা আর প্ল্যান দেখে নরাধম যেমন মজা পেল, তেমনি খুশিও হল। কর্মযোগী কাজের ছেলের মত কথা বলেছে।

গম্বুজের সঙ্গে দেখা করে নরাধম শহরের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের সব লাইব্রেরিগুলোর মোটামুটি হিসেব দিয়ে জাঁদরেল পাঠাগারগুলোর নাম একটা করে বলে গেল। তারপর যতবেশি সংখ্যায় সভ্য করা সম্ভব তাই করতে হবে, এ কথা বলল আর বলল, বিনা পয়সায় বই বিলি করতে হবে। কদিন ধরেই অগ্নিবাণের সঙ্গে গম্বুজের কথাবার্তা হচ্ছিল কবে নাগাদ সমুদ্রমন্থন সমাজপতির কাছে যাওয়া যায়। অত বড় এ্যাক্টর! গম্বুজের মনটা থমথমে ছিল আশঙ্কা উত্তেজনায়। সে বলল, ঠিক আছে, সদাসত্যর সঙ্গে দেখা করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই টাকা মঞ্জুর করিয়ে দিচ্ছি, কাজ তো পিছিয়ে থাকতে পারে না।

নরাধম হাতযশ খাস্তগীরের হাতে আস্ত করকরে নোটের বাণ্ডিল গুঁজে দিল, বলল, সর্ববিদ্যা সংগ্রহশালা আসলে বুড়োদের লাইব্রেরি, তুমি যত বেশি পার ছেলে ছোকরাদের মেম্বার করে দাও, তাদের চাঁদার জন্যে রইল এই টাকা। হিসেব মত বুঝে সুঝে খরচ করবে।

হাতযশ টাকা গুনে দেখল সমস্ত মাস্টারদের পকেট মেরেও এত টাকা পাওয়া যায়নি। চতুর্ভুজ ত্রিপাঠি পাটিগণিতের অঙ্কে অবুঝ। তবু নরাধমের হাত থেকে টাকা তিনবার ভুল গুনে চারবারের বার হিসেবে ভুল করল না। তার দায়িত্বে থাকবে প্রিজন হাউস অফ ওল্ড আইডিয়াজ।

কর্মযোগীর কাজ, অনেকটা লোক খাটানোর মত, দিনমজুরী দিয়ে। যার কাজ যত তাড়াতাড়ি হবে, যে যত বেশি পাতা কাটতে পারবে তার মজুরী তত বেশি। এতে ছোকরার দল এ ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করবে।

খুব দরকারী কাজের জন্যে যেমন স্বেচ্ছাসেবকের দল আসে পালে পালে সেই রকম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছেলের দল এল নাম লেখাবার জন্যে অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অফিসে। দোকানের হিসেবের খাতায় নাম তুলে তুলে সদাসত্যবান ক্লান্ত হয়ে পড়ল। শেষকালে এ. ডব্লিউ. এফ্. এস্-এর অফিস ঘরের বুলেটিনে জানান হল, এখন আপাতত আর লোকের দরকার নেই। সৈন্যদলে ট্রেনিং এর জন্যে নাম লেখাতে এসে বুঝি ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল ছেলের দল।

অগ্নিবাণ গম্বুজকে বললেন, এত ছেলে এরা কোথায় ছিল সব এতদিন! আলেক্জাণ্ডারের সেনাবাহিনীতেও কি এত সৈন্য ছিল! দেখ, নিজের স্বার্থ কে আর ভুলতে চায়। ছেলেরা এতদিন পরে বুঝতে পেরেছে। আর ফাঁকি চলে না।

গম্বুজ একজন বুড়ো লোককে এভাবে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

কাজে যদি মন থাকে, উৎসাহ পাওয়া যায়, আর কাজও যদি কাজের মত কাজ হয় তো ট্রেনিং দিতেও যেমন সময় লাগে কম, ট্রেনিং নিতেও তেমনি।

হাতযশ খাস্তগীর সর্ববিদ্যা সংগ্রহশালা ছেলে-মেম্বারে ভর্তি করে দিলে। কেউ কেউ লাইফ-মেম্বার হতেও ভুলল না। অর্থাৎ যখন বুড়ো হবে লাইব্রেরি তখন আর বুড়োদের থাকবে না। বই থেকে পাতা কাটায় যেমন চীনে কারিগরদের দক্ষতা দেখাল, তেমনি আরেক কায়দায় বুড়ো মেম্বার বা পাঠকদের নাজেহাল করল।

ছেলেরা তর্কালঙ্কার, বিদ্যাবাচস্পতি, ন্যায়রত্ন, তর্কচঞ্চু এই সব নামের লেখকদের বইগুলোর মলাট আস্ত রেখে তার মধ্যে পুরে দিল

এই রকম সব বই, যেমন—বানরের কলাভক্ষণ ও জীপে আরোহণ, মৈনাক পৃষ্ঠে চৈনিক পর্যটক, পাতালে সত্তর ঘণ্টা আঠার সেকেণ্ডের পর স্বর্গ যাত্রা, এই রকম আরও বই। অর্থাৎ কিনা পুরনো মলাটে নতুন বই। নরাধমের তালিকায় তো আর বইয়ের অভাব নেই। দরকার পড়লেই নরাধম সাপ্লাই দেবে।

বহু বুড়ো মেম্বার রাগে দাঁতে দাঁত চেপে গালিগালাজ করে লাইব্রেরি ছেড়ে দিলেন। সর্ববিদ্যা সংগ্রহশালা বিদ্যা সংগ্রহের চেয়ে মেম্বার সংগ্রহ করার চিন্তায় পড়ে গেল। সুযোগ বুঝে খাস্তগীর আরও ছেলেকে সভ্য করে দিল। ছেলের দল কর্তৃপক্ষকে বলল, তাদের চাহিদা মত বই রাখলে তারা মোটা টাকা চাঁদা দেবে, আরও নতুন সভ্য আসবে। কথাটা সত্যিই মন্দ নয়, আরও চাঁদা আরও সভ্য, মানে একজন বুড়ো রাগ করে ছেড়ে দেয় তো চার জন ছেলে হাসতে হাসতে আসে। তাছাড়া বই পত্তরের যা ক্ষতি হয়েছে, মানে লাখ লাখ উইতেও বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি কাটতে পারেনা, তাতে এ ছাড়া উপায় তো কিছু নেই।

প্রিজ্‌ন হাউস অফ ওল্‌ড আইডিয়াজ—সেখানেও নয় ছয় কাণ্ড। চতুর্ভুজ ত্রিপাঠির সাগ্‌রেদরাও ছুরি কাঁচি, নরুন, ক্ষুর যে যা পেল তাই চালাল হাজার কয়েক বইয়ের পেট পিঠ ফুটো করে। মানে দাঙ্গার মারপিটের মত। কাটতে কাটতে বঙ্কিম চাটুজ্জের ঐতিহাসিক নভেলও সব কেটে ফেলল। ওয়েলফেয়ার অফিসে অগ্নিবাণ যখন খবর পেলেন একটু বিমর্ষ হলেন। তাঁর বাবা সর্বনাম বঙ্কিম চাটুজ্জের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। পরে অবশ্য হাসতে হাসতে গম্বুজকে বললেন, সিরাজদৌলার ছিল একজন শত্রু, মীরজাফর। এই মীরজাফর ষড়যন্ত্র করেছিল। আর বঙ্কিম চাটুজ্জের বিরুদ্ধে কত জন ষড়যন্ত্র করেছে, এখনও নিয়মিত করছে বল তো দেখি? আজকে যারা ঐতিহাসিক নভেল লিখছে তারা বঙ্কিম চাটুজ্জের শত্রু নয় বলছ? ভালই হয়েছে, বঙ্কিম চাটুজ্জের বই কেটে ফেলেছে।

যোগীন্দির সিং-এর কাজ আসলে খুব কঠিন নয়। কিন্তু দলের লোকেদের দিয়ে কত তাড়াতাড়ি কাজ উদ্ধার করা যায়। অর্থাৎ

জ্ঞানবিজ্ঞানের যৌথখামার, ক্যাস্‌ল অফ আপ্‌-টু-ডেট নলেজ, ম্যান্‌সন অফ মডার্ন থট্‌স এই সব পাঠাগারগুলোকে পুরোপুরি হাতিয়ে নেওয়া। কারণ এদের বেশির ভাগ বই ছেলেদের চাহিদা মেটায়। লঙ্কায় অঙ্কের ঝাল, ট্র্যামেবাসে বসবাস, মৌমাছি মিছরি ও মাছের ঝোল, কানামাছি ও টানা হাঁচি, হানাদারের মুখে দানাদার, আবদুল আনোয়ার বনাম শার্দুল জানোয়ার—এই রকম হরেক রকমের বই-এর অসংখ্য কপি আছে লাইব্রেরিগুলোতে। কর্মযোগী চালাকি করে ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিলে। যার কাঁচি যতো তাড়াতাড়ি চলবে, মানে, ভাল টাইপিষ্টদের মত ঝড়ের মত পাতা ছেঁটে যেতে পারবে, তার মজুরী তত বেশি। তার নির্দেশ মত প্রতিদিন শ' খানেক ছেলে ঘণ্টা পিছু পঁচিশ থেকে তিরিশ খানা পাতা তিন থেকে চারঘণ্টা এক নাগাড়ে কেটে চলল। কেউ প্রায় কারও চেয়ে কম যায় না। এদিকে বুড়োদের বইগুলো আকারে যত পাতলা হয়, ওদিকে ছেলেদের বইগুলো সংখ্যায় তত মোটা হয়। বহু ছেলে বাড়িতে বই এনে আর ফেরত দেয় না, যদি বা দেয় পুরনো বইয়ের মলাটে আনকোরা নতুন পাতা। পুরনো প্রদীপের বদলে যেমন নতুন প্রদীপ, সেই রকম পুরনোর বদলে নতুন বই।

অনেক বুড়োর, বাড়িতে বই আনার পর, চোখ কপালে উঠেছে। সীতার বনবাসের বদলে চিতার ফোঁসফাস কিংবা দুর্গেশনন্দিনীর বদলে দূরদেশে বন্দীবীর। কিংবা কপালকুণ্ডলা হাতে বই খোলবার পরই দেখা গেল মলাটের আড়ালে, কপাট খুলল না।

অনেক অনেক ছেলেরা বাড়ির রিপোর্ট যা দিল তা থেকে ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির অফিস মারফত জানা গেল, দাদু দাদামশায়রা জোট বেঁধে কাগজপত্তরে লাইব্রেরিগুলোর বিরুদ্ধে চিঠিপত্র লেখার তোড়জোড় চালাচ্ছেন।

লাইব্রেরিগুলোর এখন আর কোন কথায় কান দেবার সময় নেই। তারা ক্ষতিপূরণের চিন্তায় ব্যস্ত। তারা বিনা পয়সায় যত বই পাচ্ছে তা দিয়ে লাইব্রেরি বোঝাই করছে। আর তাদের সভ্য সংখ্যা

রাতারাতি চতুর্গুণ হয়ে উঠল। এমন অবস্থায় এসে ঠেকেছে আর জায়গা দেওয়ার উপায় নেই, বই হাতে ময়দানে বসে পড়তে হবে।

সংবাদ ভাণ্ডারে শহরের বিশেষ খবরের তালিকায় ছাপা হল: বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে নিতান্ত স্কুল বালকদের জ্ঞানচর্চা প্রবীণ জ্ঞানী বৃদ্ধদেরও বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে। এই জ্ঞানচর্চা উত্তরোত্তর এমনই বৃদ্ধি পাইতেছে যে বৃদ্ধেরা হা হুতাশ শুরু করিয়াছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে কয়েকটি জ্ঞানবৃদ্ধ বালক রীতিমত শব্দভুক হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা মুখরোচক খাদ্যের পরিবর্তে কঠিন কঠিন সমাসবদ্ধ ও সন্ধিযুক্ত শব্দ ক্রমাগত গলাধঃকরণ করিতেছে।

অগ্নিবাণ ব্রহ্ম যখন গম্বুজকে নিয়ে সমুদ্রমন্থন সমাজপতির বাড়িতে এলেন তখন সমাজপতি মশাই হাতে এক গোছা কাগজ নিয়ে কি সব কাটাকুটি করছিলেন।

অগ্নিবাণ পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে তিনি মাথা তুললেন। গম্বুজও আর দেরি না করে চটপট প্রণাম সেরে নিল।

অগ্নিবাণ আগে থাকতে বলে কয়ে গিয়েছিলেন। সমাজপতি বসতে বললেন। হাতের কাজ সারতে বিশপঁচিশ মিনিট নিলেন। গম্বুজ ইতিমধ্যে ঘরের দেয়ালের ছবিগুলো দেখছিল। সব ছবিগুলোই সমুদ্রমন্থনের। কোনটায় রাবণ, কোনটায় রবার্ট ক্লাইভ, কোন ছবিতে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, কোন ছবিতে অন্ধ ভিখারি বেশে ডিটেক্‌টিভ, কখন কুকুরবেশে ধর্মরাজ, কখন হংসরূপে রাজপুত্র কখন বা গন্ধমাদন পর্বত মাথায় বীর হনুমান।

গম্বুজকে এক পলক দেখে নিয়ে অগ্নিবাণকে বললেন, একজন রাইটার আমার জীবনী লিখছে। এত সব ভুল খবর যে কাটতে কাটতে কলম বেঁকে যাচ্ছে। এরা ভাবে যা খুশি লিখলেই মহাপুরুষের জীবনী হল।

কথা বলতে বলতে এত ঘন-ঘন হেঁচকি তুলেছিলেন সমুদ্রমন্থন যে গম্বুজ প্রায় হেসে ফেলেছিল। সমাজপতি বুঝতে পারেন নি।

অগ্নিবাণ গম্বুজকে নির্দেশ করে বললেন, এর কথাই বলেছিলাম স্যার আপনাকে।

সমাজপতিকে দেখে গম্বুজের মনে হল এবার তিনি কিছু বলবেন। সমাজপতি শুরু করলেন, তুমি এ ব্যাপারে বলাতে আমি উৎসাহ পেয়েছি কেন জান? আজকালকার কিছু নামকরা আর্টিষ্টদের ব্যবহারে ক্ষেপে গিয়ে। তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শিখেছে।

হেঁচকির ঠেলায় বার বার বাধা পাচ্ছিলেন সমুদ্রমন্থন। সামলে নিয়ে আবার শুরু করলেন, অথচ এরা জানে না, আজ এই বয়সেও যে কোন পার্ট চাইলে আমি পেতে পারি, শুধু কথা বলার সময় এই হেঁচকির ছিঁচকেমি....বলতে বলতে আবার কয়েক ডজন হেঁচকি তুললেন। সামলে নিয়ে সমুদ্রমন্থন বললেন, বাতের ব্যথা সহ্য হয়, তোতলামি তাও মনে হয় জিবের তলায় চাপতে পারি, কিন্তু এই যে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে ঘড়ির এ্যালার্ম বেলের মত গলার মধ্যে বেজে ওঠে—থামলেন সমুদ্রমন্থন।

কিছুক্ষণ থামার পর বললেন, এই জন্যেই তো আজকাল আর পার্ট নেওয়া পোষায় না। সবাই ভাবে আমি বুঝি আর বেঁচে নেই। লাস্ট ইয়ারে জন্মদিনে একজন বুড়ো এ্যাক্টরেরও মুখ দেখতে পাইনি। গম্বুজ বুঝতে পারল বলতে বলতে সমাজপতি মশায়ের মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। শেষে বললেন, থিয়েটার সিনেমা লাইনের যত বড় বড় মক্কেল এ বাড়িকে মনে করে তীর্থস্থান। তাই ভাবছি বুড়োদের দর্প গুঁড়ো করে দিয়ে গর্ব খর্ব করি। জন্মদিনে এক টুকরো চিঠি পর্যন্ত কেউ পাঠায়নি! তারপর গম্বুজকে উপদেশ ও উৎসাহ দেওয়ার জন্যে নিজের জীবনের অনেক বীরত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করলেন। বললেন, আজকালকার অভিনেতাদের মত ফাঁকি দিতেন না, শৌখীন ছিলেন না। হনুমান সেজে এক গাছের ডাল থেকে আরেক গাছের ডালে লাফ মেরেছেন চোখ বুঁজে। এক পাহাড় ডিঙিয়ে আরেক পাহাড়ে গেছেন। কুকুরবেশী ধর্মরাজ সেজে গৌরীশৃঙ্গের অনেকখানি উঠেছিলেন। হংসরূপী রাজপুত্র সেজে মাঘ মাসের রাতে জলে গা ভাসিয়েছেন। রবার্ট ক্লাইভ সেজে এমন ভাবে ঘোড়ার লাগাম ধরেছেন অনেক সাহেব দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে উঠে স্যালুট করেছে।

শুনতে শুনতে গম্বুজের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। অগ্নিবাণ চোখ বুঁজে ফেলেছিলেন।

অগ্নিবাণকে এতক্ষণে দরকারী কথাটা বললেন সমাজপতি, তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে নরসিংদাস প্রেমভগবত্ হিম্মত্ সিং এর সঙ্গে দেখা কর। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ওই এখন হর্তাকর্তা। আমার চার পাঁচখানা ছবিতে নর্সিং প্রচুর টাকা লাভ করেছিল। আমাকে খুব খাতির করে। কাউকে ওঠান আর বসানর হিম্মত আছে লোকটার। এখনও চন্দ্রগুপ্ত আর বীরহনুমানের পার্টের জন্যে আমাকে চিঠি লেখে। আমি ভাল করে লিখে দিচ্ছি।

গম্বুজকে একেবারে শেষে বললেন, ছোকরা আর মাঝবয়সী আর্টিষ্টরা একটু সুযোগ একটুখানি চান্সের জন্যে যেখানে হন্যে হয়ে ঘুরছে সেখানে তুমি বুড়ো ঘুঘু আর্টিষ্টদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছ, একথা মনে রেখ মাস্টার চৌধুরি। যদি একবার ফিল্ড করে নিতে পার তো তোমাকে মারে কে। আর তোমার পেছনে যে থাকবে, সেই প্রেম ভগবত্ হিম্মত্ ইচ্ছে করলে সকাল বিকেল ছবি তুলতে পারে। আরও তোমাকে বলে রাখি, হিম্মত সিং-এর বইতে একটু চান্স পাওয়ার জন্যে বহু বুড়ো এ্যাক্টর ডন্ বৈঠক দিচ্ছে দুটি বেলা।

প্রেমভগ্বত্ হিম্মত সিং-কে খসখস করে লিখতে লিখতে সমুদ্র-মন্থন জিজ্ঞাসা করলেন, গম্বুজ এর আগে কী রকম অভিনয় করেছে। গম্বুজ একটু ভয়ে ভয়ে বলল, গত বছরে স্বাধীনতা দিবসে রানী স্বর্ণস্যাঁকরাণী সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের ষ্টেজে প্রতাপ সিং-এর ঘোড়া চৈতকের পার্ট করে সে তার নিজের ওজনের একটা তরমুজ পেয়েছিল।

অগ্নিবাণ গেলেন না, সাহসে ভর করে গম্বুজ একাই গেল হিম্মত সিং-এর কাছে। হিম্মত সিং কি সহজে দেখা দেওয়ার লোক নাকি! পাঁচজন দারোয়ান আর দুজন সেক্রেটারি পেরিয়ে তবে সপ্তম স্বর্গের দরজায় এসে পৌছয়। সে বলেছে, সে সমুদ্রমন্থন সমাজপতির বাড়ি থেকে আসছে। সমাজপতি মশাই আবার ফিল্মে নামতে চান।

আনন্দের বহর দেখে কে! প্রেমভগ্বত্ হিম্মতসিং বিরাট ভুঁড়ি

আর বিপুল দেহ নিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এসেছেন। আর তাঁকে ঘরের বাইরে পাওয়া মাত্র গম্বুজ পকেটের চিঠি হাতে দিয়েছে। একটি মুহূর্ত গম্ভীর মুখ করলেও হিম্‌মতসিং সমাদরে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

গম্বুজ বুঝতে পারে লোকের মত লোক হলে সাধারণ একখানা চিঠির দাম কি হতে পারে। নটরাজ সমুদ্রমন্থন যার জন্যে চিঠি লিখছেন তাকে আর কী পরীক্ষা করবেন প্রেমভগ্‌বত্‌! শুধু বললেন এক নম্বর ছবিতে যদি সে নাম করতে পারে তা'হলে তাকে আরও সুযোগ দেওয়া হবে। হিম্‌মত্‌ সিং সোজা কথায় বোঝেন টাকা। সমুদ্রমন্থনকে মনে রেখেছেন কি শুধু শুধু! সমুদ্রমন্থন তাঁকে টাকার সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দিয়েছেন। আর তিনি সেই সমুদ্রে দিনরাত্তির হাবুডুবু খেয়েছেন। বুড্‌ঢা আদ্‌মিদের হটিয়ে লেড়্‌কালোক যদি নিজেদের বাজার করে নিতে পারে তো তাঁর কোন লোকসান নেই।

নরসিং দাস প্রেমভগ্‌বত্‌ হিম্‌মত্‌ সিং-এর কাছ থেকে এমন আশা ভরসা পেয়ে গম্বুজ ছুটে এল সমুদ্রমন্থন সমাজপতির কাছে। তাঁর উপদেশ এখন বিশেষ দরকার।

সমাজপতি বললেন, দেখ, মানুষ কি কখনো মানুষ দেখে মজা পায়? পয়সা দেয়? দুটো পা দুটো হাত তো সব মানুষেরই আছে। তাতে বাহাদুরি কি! আমি নিজে রামভক্ত হনুমান, কুকুররূপী ধর্মরাজ আর হংসরূপী রাজপুত্র—এই সব পার্ট করে সবচেয়ে বেশি হাততালি পেয়েছি। তুমি হিম্‌মত্‌কে বল তোমাকে বৃক্ষরূপী দানব, বেড়ালরূপী ব্যাঘ্র এই সব পার্ট দিতে। বুঝিয়ে বললেই হিম্‌মত্‌ সিং গল্পের মধ্যে এই সব পার্ট ঢুকিয়ে দেবে। তুমি যদি বাহাদুরি দেখাতে পার তো দেখবে হাততালির চোটে কান ফেটে যাবে। সব সময় মনে রাখবে, যে-সব জিনিস আমরা পথেঘাটে রোজ দেখি তা দেখে মানুষ মজাও পায় না, দেখতেও চায় না।

সমাজপতির কথা তো আর ফেলা যায় না। হিম্‌মত্‌ সিং রাজী হয়ে গেলেন! আর গম্বুজও বৃক্ষরূপী দানবের পার্ট করল।

অনেক বুড়ো পুরনো এ্যাক্টর বড় বড় পার্ট নিয়েও কিছু করতে

পারল না। গম্বুজ মারমার কাটকাট কিছু একটা করে বসল। বটগাছ, তার চতুর্দিকে গোল ছায়া। কিন্তু পথিক যেই সেই ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে অমনি দানব বেরিয়ে এসে তাকে গিলে ফেলবে। শেষে একটা বুনো মোষ একদিন তেড়ে ফুঁড়ে এসে গাছের গুঁড়িতে শিং উঁচিয়ে গুঁতোলে দানবটা পেট ফেটে মরে গেল।

গম্বুজের এ্যাক্‌টিং হিম্‌মত্‌ সিংকে মুগ্ধ করল। তিনি বললেন, তুমিও একদিন সমাজপতির মত নামজাদা এ্যাক্‌টর হবে।

এক নম্বর ছবিতে যে রকম হৈ-রৈ মারমার ব্যাপার করল গম্বুজ হিম্‌মত্‌ খুশির চোটে তাকে দু নম্বর বইতে বেড়ালরূপী ব্যাঘ্রের পার্ট নিতে বললেন। গম্বুজ স্মরণ করল সমুদ্রমন্থনের কথা। সে বেড়ালরূপী ব্যাঘ্র সাজল। বনের বাঘ সাধুর কৃপায় বেড়ালের বেশে শহরে এসেছে। সে মনিবের বাড়ি থেকে রাতে বেরিয়ে যায়, গরু ছাগল হাঁস মোষ যা পাবে তাই খাবে। পরে আবার বেড়াল সেজে বাড়ি ঢোকে। একদিন তার মানুষ খাওয়ার শখ জাগল। মনিবের ছেলের কচি মাংস খাওয়ার লোভে সে যেই বেড়াল থেকে খানিকটা বাঘ হয়ে বেরিয়েছে খাবে বলে, মনিব দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে! ভয়ের চোটে বাঘ আবার বেড়াল হয়ে জানলা গলিয়ে রাস্তায় লাফ মেরে এক ছুটে পালাল বনের দিকে।

ছেলেবুড়ো সবাই এই দেখে হেসে লুটোপুটি কুটিপাটি। বুড়োর দল দলে দলে বুঝতে পারে গম্বুজ চৌধুরির নামে দর্শক পাগল! এমন মজা আর কেউ দেখাবে না! পয়সার পুষ্পবৃষ্টি শুরু হল।

হিম্‌মত্‌ সিং গম্বুজকে আরও বেশি বেশি উৎসাহ দিতে লাগলেন। প্রেমভগ্‌বত্‌ বললেন, তুমি এই লাইনে সোজা চলে এস। তোমার বিদ্যেবুদ্ধি কাজে লাগাও। নরসিংদাস প্রেমভগ্‌বতের কথা শুনে অগ্নিবাণ বললেন, কোন্ লাইনে যে ওর মাথা খুলবে না বলা মুশকিল।

সংবাদ ভাণ্ডারে গম্বুজের নাম ছবি ছাপা হল, ফলাও করে খবর বেরল, নিজের নামের উপযোগী এক বালক অভিনেতা চিত্রজগতে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইয়াছে। বহু বৃদ্ধ অভিজ্ঞ নট তাহার ক্ষমতা

দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। এবং বহু বয়স্ক অভিনেতা পরাজয়ের দুঃখে চিত্রজগত হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। সরকারের দৃষ্টি এবং বিখ্যাত চিত্রব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নরসিং দাস প্রেমভগ্‌বত্‌ হিম্মত্‌ সিং-এর দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষিত হইয়াছে। বালক অভিনেতাদের সর্বপ্রকার উৎসাহ ও সাহায্যদানের নিমিত্ত তাঁহারা বদ্ধপরিকর। গম্বুজ চৌধুরির নেতৃত্বে বালক অভিনেতাদের এক বিপুল শোভাযাত্রা কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিদর্শন করিবে। জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে তাঁহারা যেন বিশেষ সতর্কতার সহিত গাড়ি ঘোড়া চালনা করেন, কারণ নাবালকের দল আত্মহারা হইয়া নিজেরাই দুর্ঘটনার হেতু হইতে পারে।

জ্ঞানী গুণী অশ্বমেধের কাজ হল খোঁজা! মন প্রাণ দিয়ে খোঁজা, চোখ কান খুলে খোঁজা, হাত পা খাটিয়ে খোঁজা, ঘরে খোঁজা মাঠে খোঁজা। অশ্বমেধ বসে থাকেনি। সে ইতিমধ্যে অনেক খুঁজেছে, খুঁজে হয়রাণ হয়েছে। একদিন ঠিক করল শেষে লটারি করবে নাকি। কিন্তু তাই বা কি করে হয়! যোগ্য ব্যক্তি হওয়া চাই তো, যদি তা না হয়!

ক্লান্ত হয়ে একদিন খিদিরপুর ডকের ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ বুঝতে পারল কে তার চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে বসল চোখ পাকিয়ে রাগের চোটে।

দেখল তাদের বয়সী একজন ছেলে। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল. জাহাজ এক্ষুণি ছেড়ে দেবে ভাই। খুব তাড়া আছে, সেইজন্যে তোমার চুলের মুঠি ধরে টেনেছি, তুমি নাক ডাকাচ্ছিলে কিনা।

—বুঝেছি আমার অপরাধ হয়েছে। তা কী করবটা কি এখন? দাঁতমুখ ভেংচিয়ে বলেছে অশ্বমেধ।

—আমার বন্ধু দুষ্কৃতকারী অধিকারীকে একটা খবর দিতে হবে। গো-ডাউন মিড্‌ল স্কুলে গেলেই ওর খোঁজ পাবে। বলবে অকৃতকার্য ভট্টাচার্য বলেছে, আইনসভায় সদস্যদের মজার খবরগুলো এবার সে সংবাদ ভাণ্ডারে ছেপে দিতে পারে। ওরা তো মজার আর আজগুবি খবরই বেশি চায়। আমার বাবার দুজন বন্ধু আছেন আইনসভায়

সদস্য। সেই ভয়ে ছাপতে পারিনি। তুমি কাইগুলি খবরটা দিও। আমার জাহাজ ছাড়ল বলে।

—সব শুনে টুনে ঘুম তো উড়ে গাছে পালাল, অশ্বমেধ বলল। তুমি যাচ্ছ কোথায়, আর যাচ্ছই বা কোন দুঃখে ?

অকৃতকার্য বলল, এক নম্বর আমি থাকলে খবরগুলোর একটাও ছাপা যাবে না, বাবা তাড়িয়ে দেবে। দু নম্বর আমি নিজে স্কুল তৈরি না করলে আমার আর কোন স্কুলে পাশ করার চান্‌স নেই! সেই জন্যে মনের দুঃখে চলে যাচ্ছি।

অশ্বমেধ অনেক কিছু ভেবে ফেলেছিল এর মধ্যে। বলল, ধর তোমাকে যদি বিধান সভার সভ্য করে দেওয়া যায়, তা হলে কি তোমার বাবা রাগ করতে পারেন ? তোমার খবরগুলো সংবাদ ভাণ্ডারে ছাপতেই হবে। তোমার কোন ভাবনা নেই। তুমি আমার সঙ্গে চলে এস। তুমি বিধানসভার সভ্য হলেই তোমার বাবা আবার তোমাকে ডেকে নেবেন। তবে তোমায় কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

অকৃতকার্য ভট্টাচার্য ভাবল, কোথায় বা যাবে জাহাজে চড়ে কোন অজানা অচেনা মুল্লুকে, তার চেয়ে দেখাই যাক এর কথা শুনে, কি হয় শেষ পর্যন্ত। খিদিরপুরের ডক তো আর উড়ে যাচ্ছে না, আর ডক থাকলে জাহাজও ঠক ঠক কয়ে এসে ঠেকবে।

অশ্বমেধ অকৃতকার্যকে নিয়ে সোজা চলে এল পরমার্থপ্রাপ্তিযোগ স্ট্রিটে অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অফিস ঘরে।

—বল কী কী খবর আছে তোমার, অশ্বমেধ ভট্টাচার্যকে বলল।

—দুটো মজার খবর আগে দিচ্ছি। বিধানসভার দুজন নামকরা সভ্য খুব ভোরে প্যারেড গ্রাউন্‌ডে আমাদের স্কুলের, মানে আমি শেষ যে স্কুলে পড়েছি সেই আন্‌ডারগ্রাউন্‌ড নলেজহোমের ছাত্র, অতলান্ত তলাপাত্রকে সাইকেল চড়া শেখাতে বলেন। তলাপাত্র নামকরা সাইক্লিস্‌ট। শেখাতে পারলে একখানা খুব দামি সাইকেল দিতে হবে। যেই শেখা হয়ে গেল পুরনো বাজার থেকে পুরনো সাইকেল জোড়াতালি দিয়ে জুড়ে রং করে নতুন বলে চালিয়ে দিয়ে গেল। অতলান্ত তলাপাত্র

কি ছাড়বার পাত্র! কিন্তু তাদের দেখা পাচ্ছে না, গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। দু নম্বর হচ্ছে, আরেক জন নামকরা বুড়ো এম. এল. এ. তাঁর বাবার নামে এক ফুটবল প্রতিযোগিতায় একখানা বড় শিল্‌ড দেবেন বলেছিলেন। ফাইনাল ম্যাচের দিনও ছেলেরা কিছু জানতে পারেনি। যারা জিতল তারা চায়ের কাপের মত ছোট একটা জার্মান-সিলভারের কাপ পেল। এই সব খেলোয়াড়দের অনেকে আমাকে চেনে, মানে আমার ফ্রেন্‌ড। আমার সাহায্য চাইল। সংবাদ ভাণ্ডারের জন্যে আমি খবরটা জোগাড় করে রেখেছি। শুধু বাবার ভয়ে ছাপাতে পারছি না।

শুনে অশ্বমেধ বলল, ছাপলে আর দেখতে হবে না।

যা ভাবল অশ্বমেধ তাই হল। সংবাদ ভাণ্ডার তো লুফে নিল খবর দুটো, সাহস করে ছেপে দিল। যুদ্ধের খবর কিংবা দুর্ঘটনার খবর যেমন বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়। একদিনে রাতারাতি কাগজের বিক্রি দু গুণ বেড়ে গেল।

তারপর সংবাদ ভাণ্ডার অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অফিসে অশ্বমেধকে জানাল, এম এল. এ. তিনজন গোপনে ছদ্মবেশে অকৃতকার্য ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে চান।

অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির গোপন কক্ষে অশ্বমেধের উপস্থিতিতে অকৃতকার্য ভট্টাচার্যের সঙ্গে তিন এম. এল. এ.-র আলোচনা সভা বসল। দরজায় পাহারায় থাকল সদাসত্য। পুরো একটি ঘণ্টা তিপান্ন মিনিট ঊনপঞ্চাশ সেকেন্‌ড্ আলোচনার পর ঠিক হল তাঁরা ক্ষতিপূরণ করবেন। তবে সাইকেল বা শিল্‌ড দিয়ে নয়। সুদে আসলে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। দু-জন সভ্যকে পদত্যাগ করতে হবে। এবং সেই দু জায়গায় অকৃতকার্য ভট্টাচার্য ও তার বন্ধু অতলান্ত তলাপাত্র নির্বাচিত হবে। দুজনেরই সাহস আছে। একজন বাড়ি ছেড়ে জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিল আর একটু হলেই; আরেক জন তিনবার সাইকেলে ভারতভ্রমণের চেষ্টা করেছিল। একবার মামা জানতে পারে। পুলিশকে জানায়। পুলিশ ইছাপুরে তার ইচ্ছে খতম করে। আরেকবার সব ঠিকঠাক। কিন্তু সেজমাসির বিয়েতে অনেক দিনের জন্যে

চক্রবেড়িয়া রোডে বন্দী থাকতে হল। দ্বিচক্রের পায়ে বেড়া পড়ল। আর শেষবারে মাঝ পথে আই· বি· ডিপার্টমেণ্টের একজন কর্তা এমন জেরা শুরু করল যে মনে হল সে চুরি করে পাকিস্তানে পালাচ্ছে চোরাই মাল নিয়ে। তলাপাত্র গলবস্ত্র হয়ে মাপ চেয়ে ফিরে আসে সোজা বাড়িতে।

সংবাদ ভাণ্ডার এবার যখন অকৃতকার্য ভট্টাচার্য ও অতলাস্ত তলাপাত্রের এম. এল.এ. হওয়ার সংবাদ ছাপল, স্কুলের ছেলেরা খুশির চোটে সব কাগজ কিনে নিল। বাড়িতে বাড়িতে বুড়োর দল ছেলেদের হাতে সংবাদ ভাণ্ডার দেখে রাগে জ্বলে গেল, ছটফট করতে লাগল, সারারাত ঘুমতে পারল না, সকালে উঠে কথা বন্ধ করে দিল। পাড়ার মোড়ে, রাস্তার ধারে যেখানে পাঁচজন বুড়ো জটলা পাকায় তার উলটো দিকে দশজন ছেলে ; যেখানে দশজন বুড়ো সেখানে বিশজন ছেলে। বেশ বোঝা যায় ছেলে বুড়োর দুটো দল হয়ে গেছে।

ধর্মসাক্ষী সিকদারের কলে সিদ্ধিদাতা গণেশের মত বসে থাকত বটে পরশরতন, কিন্তু হাজার রকম লোকের হাজারো গলায় বিশ রকম ভাষার আলাপ কান খাড়া করে শুনত। হাটে মাঠে ঘাটে, দোকানে বাজারে ভিড়ে, মিছিলে সভায় ধর্মঘটে, ঘর উঠোন ছাদে, দিনে দুপুর রাতে সে শুনতে পেত লক্ষ কণ্ঠে মানুষ হিন্দি বাংলা ইংরেজিতে কথা বলছে, না, কথা কাটাকাটি করছে, ভাষা নিয়ে খাসা হাঁকাহাঁকি চলেছে, বুঝি গলার জোর টেস্‌ট করা হচ্ছে জোরালো মাইক্রোফোনে। মাস্‌টার-মশাই থেকে ফেরিওয়ালা পর্যন্ত সে চষে বেড়ালো যত্র তত্র।

পরশরতন ভাবতে ভাবতে রোজ সকাল সন্ধে একটু একটু করে লিখে ফেলল :

গলার জোরে ভাষার বড়াই
উড়ছে যেন চিল আর চড়াই
হিন্দি বাত আর বাংলা ভাষায়
লড়াই লাগায় চোস্ত চাষায়।
ইংরেজি ঢং চর্‌কি বাজি
ইচ্ছে করে সাহেব সাজি।

কিসের লড়াই করছে লোকে
মরছে সবাই ভাষার শোকে ?
বেড়াল ডাকে কেমন মিহি
অশ্ব ডাকে চিঁহি চিঁহি
সিংহি মামার হালুম হালুম
ডাক শুনে ঠিক হচ্ছে মালুম,
হাজার ভাষায় মানুষ ডাকে
ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকে।
শেয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া
কেমন ডাকে কাকাতুয়া
ডাক ছেড়েছে হাম্‌বা চালে
দলে দলে গরুর পালে,
মানুষ ডাকে হাজার ভাষায়
কে জানে কোন লাভের আশায় !
হিন্দি যদি লাফিয়ে চলে
বাংলা তখন উড়ব বলে
ইংলিস্ তার বাদশাহী বোল
শিখতে গেলেই গণ্ডগোল।
বাংলা ভাষায় হিন্দি সুর
ইংরেজি নাচ নয়কো দূর
ইংলিসে তাই হিন্দি গান
বাংলা ভাষাও দেয় জোগান।
হ্যাট্ কোট টাই সবাই চাই
বাংলা হিন্দি ভাই-ভাই !
সব শেয়ালে হুক্কা হাঁকে
হাজার ভাষায় মানুষ ডাকে
মানুষ ডাকে হাজার ভাষায়
কে জানে কোন লাভের আশায় !

হিন্দি বাংলা ইংরেজির সমস্যায় চিন্তা করতে করতে কাহিল হয়ে গিয়ে পরশরতন একদিন সবটা লিখে ফেলল। গম্বুজকে আর অগ্নিবাণকে পড়ে শোনাল। বলল, তার যা কিছু আলোচনার আছে সব এরই মধ্যে পাওয়া যাবে। এখন দরকার একটা প্রকাণ্ড ঘরের। সব ছেলেকে ডেকে জড়ো করে বক্তৃতা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো দরকার।

গম্বুজ হিম্মত্ সিং-এর সঙ্গে দেখা করে এ-কথা বলতেই তিনি শহরের একটা বড় সিনেমা হলের ব্যবস্থা করে দিলেন। সিনেমা হলের বাইরে পোস্টারে লেখা ছিল, হিন্দি-বাংলা-ইংরেজির লড়ায়ের আজ শেষ দিবস। বিরাট আয়োজনের ব্যবস্থা হ'ল অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তহবিল থেকে।

অগ্নিবাণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অফিসে যারা দলে দলে এসেছিল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর মত, তারা আজ যে যেখানে ছিল এল হাতের কাজ ফেলে, খাবারের প্লেট পায়ে ঠেলে।

সিনেমা হলে হাউস-ফুল হ'লে যে রকম অবস্থা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা। রীতিমত ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি। চতুর্দিকের অবস্থা দেখে শুনে অগ্নিবাণের মনে হল তাঁর বয়স কমতে কমতে ছেলে-ছোকরার বয়সে এসে ঠেকেছে। নকল দাঁতের পাটি আর নকল মনে হল না। মনে হল ছোট ছেলেদের মত ডাঁসা পেয়ারা চিবিয়ে গুঁড়ো করে দিতে পারেন।

সভা সমিতি ঠিক সময়ে আরম্ভ হবে বললেই কি আর আরম্ভ হয়! হয় সভাপতি আসতে দেরি করেন, না-হয় প্রধান প্রধান বক্তাদের কেউ কেউ এসে পৌঁছন নি, অথবা হট্টগোল থামাতে থামাতে ঠিক সময় পার হয়ে যাবেই।

দারাসিং যতদূর সম্ভব ছেলেদের শান্ত রাখার চেষ্টা করছিল। সদাসত্যবান জলের পাত্র নিয়ে পানি-পাঁড়ের মত ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছিল।

গম্বুজ শান্তকণ্ঠে মাইক্রোফোনে ঘোষণা করল পরশরতনের নাম। বলল কী উদ্দেশ্যে তারা সবাই জড়ো হয়েছে আজ এখানে।

পরশরতন সমস্ত লেখাটা ছেলেদের মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে

পড়ে শোনাল। উত্তেজনায় ছেলেরা হৈ-হৈ শুরু করলে গম্বুজ দু হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বলল। সমস্ত সিনেমা হল একটি নিমেষে স্তব্ধ।

এবার শোনা গেল পরশরতনের গলা : ভাই সব মনে রাখতে হবে আমরা মানুষের ডাকের জন্যে লড়ায়ে নেমেছি, অর্থাৎ আমাদের লড়াই শেষ হলে আমরাই ঠিক করব, মানুষ কোন ভাষায় ডাকবে। সেইজন্যে হিন্দি-বাংলা-ইংরেজির লড়ায়ের আজ শেষ দিবস, কারণ আমাদের শপথ নেওয়ার দিন আজই—আমাদের বিদ্রোহের শপথ। যা চলে আসছে তাই, ঠিক তাই আমাদের মানতে হবে এমন কি কথা আছে! ভাষা তো আর কিছুই নয় শব্দ, মানে আওয়াজ, আমরা গলা দিয়ে বার করি। মানুষ স্পুটনিকের কথা কোন দিনও ভাবতে পেরেছিল? এমন দিনও আসতে পারে সামনে যেদিন গুড্ মানে হবে ব্যাড্, কিংবা নো মানে হবে ইয়েস্। আমরা শুনে আসছি বহুকাল ধরে বেওকুফ, দুষমন্, ডাকু হিন্দি কথা, আর বোকা বজ্জাত ছিঁচকে সব বাংলা কথা। কিন্তু এমন দিনও আসতে পারে যেদিন জানতে পারব সবই উলটো। সব শেয়ালের যদি এক ডাক হয়, সব মানুষের এক ডাক হবে না কেন? আর বুড়োর দল যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না-ও করে তো আমরা আরও জোর গলায় বলি, ছেলের দলের ডাক মানেই একটি মাত্র ডাক, যাকে বলে বাজখাঁই ডাক, এককথায় হাঁকডাক। সে ডাকের নামডাক বুড়োদের কানে তালা লাগিয়ে দেবে। আমার, ফের দুঃখ করে বলতে ইচ্ছে করছে—

কে জানে কোন লাভের আশায়
মানুষ ডাকে হাজার ভাষায়!

বড় বড় বক্তাদের ঢঙে হাতের মুঠি উঁচু করে পরশরতন গলা ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁক পাড়ল—ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ।

ছেলের দল সঙ্গে সঙ্গে গলা ছাড়ল, ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ; কেউ কেউ বলল, হেলেন কিলার জিন্দাবাদ। আবার পরশরতনের গলা, আমাদের বিদ্রোহ বেঁচে থাক। ছেলের দল প্রতিধ্বনি তুলল, আমাদের বিদ্রোহ বেঁচে থাক; পিছন থেকে কেউ কেউ বলল, মামাদের বিগ্রহ ছেঁচে যাক।